ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা ।। ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ১ জুন, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

মুসলিম তোষণের প্রতিযোগিতায় নেমেছে সি পি এম-তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। আগামী বিধানসভা ভোট পর্যন্ত মুসলিম ভোট পেতে সিপিএম এবং তৃণমূল কংগ্রেস জোটের মধ্যে বিপদজনক প্রতিযোগিতা অব্যাহত থাকবে। লোকসভা ভোটের ফলাফলের বিশ্লেষণ

করে বাম এবং ডান উভয় পক্ষই মনে করছে বিধানসভার দখল পেতে মুসলমানরাই তুরুপের তাস। ২৭ শতাংশ মুসলমান ভোটের জন্য ৭৩ শতাংশ হিন্দুর স্বার্থ নিয়ে কেউই চিন্তিত নয়। ফলে আগামী ২ বছর হিন্দুদের কাছে অত্যন্ত অপমানকর হতে চলেছে বলেই রাজনৈতিকমহল মনে করছে। বাম-ডান দু'পক্ষই মুসলিমদের জন্য গুচ্ছ গুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণার পরিকল্পনা করে রেখেছে। সিপিএম নেতৃত্ব মনে করছে, মুসলমানরা তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণেই বিরোধীরা এত আসন পেয়েছে। সেই কারণে ধস সামাল দিতে কিছুদিনের মধ্যেই একজন মুসলিম উপমুখ্যমন্ত্রী বসানোর ছক রয়েছে তাদের। মুসলিমদের শিক্ষা এবং চাকরিতে সংরক্ষণ দিতেও তারা এবার জোর কদমে এগোবে। সি পি এম বুঝেছে, কেবলমাত্র কিছু প্রকল্পের টাকা ছড়িয়ে মুসলমানদের মন পাওয়া যাবে না। সেই কারণে সংরক্ষণের মতো আগুন নিয়ে খেলতেও তারা পিছপা নয়। এদিকে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও মুসলিম তোষণের রাজনীতিই করছেন। দলীয় এম পি সুলতান আহমেদকে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের সংখ্যালঘু উন্নয়ণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী করতে চলেছেন। সুলতান আহমেদকে নিয়ে তৃণমূলও মুসলমানদের জন্য এক গুচ্ছ সুযোগ-সুবিধা ঘোষণা করতে চলেছে। মুসলিমদের নিয়ে এই নাচানাচির আবহাওয়ায় এ রাজ্যের ৬ কোটির বেশি

(এরপর ৪ পাতায়)

দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অনুপভূষণ হচ্ছেন রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখার প্রধান

গুঢ়পুরুষ ।। লোকসভা নির্বাচনের বিপর্যয়ের পরেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কোনও শিক্ষা নিয়েছেন বলে মনে হয় না। শিক্ষা নিলে তিনি একজন হাইকোর্টে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত দলদাস অবসরপ্রাপ্ত আই পি এস অফিসারকে রাজ্যের ভিজিলেন্স কমিশনের প্রধান পদে বসানোর সিদ্ধান্ত নিতেন না। মহাকরণ সূত্রে জানা গেছে, সদ্য অবসরপ্রাপ্ত ডি জি পি অনুপভূষণ ভোরাকে ভিজিলেন্স কমিশনের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে গেছে। এই পদটি দীর্ঘকাল শূন্য ছিল। মুখ্যসচিব তাঁর পদমর্যাদাবলে এতকাল কাজ চালাচ্ছিলেন। পদটি খালি রাখা হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছায়। মুখ্যমন্ত্রী আগেই ভেবে রেখেছিলেন এই পদে তাঁর বশংবদ পুলিশ অফিসার ভোরা সাহেবকে বসাবেন। এবং তা সরকারি নিয়ম নীতির কোনও তোয়াক্কা না করেই।

হ্যাঁ, সরকারি নিয়মে অনুপভূষণ ভোরাকে ভিজিলেন্স কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো যায় না। কারণ, ২০০৭ সালের ১৫ জানুয়ারি কলকাতা হাইকোর্ট আদালত অবমাননার দায়ে শ্রীভোরাকে ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড দেয় এবং ২ হাজার টাকা জরিমানা করে। এই আদেশের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছে। সেই আপিল মামলা আজও ঝুলে আছে। আপিল মামলা ঝুলে আছে বলেই তিনি নিরপরাধ নিষ্কলঙ্ক তা ধরে নেওয়াটা সরকারি নিয়ম নীতি নয়। জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চ স্থাপনের দাবিতে সেখানে আন্দোলন চলাকালে বিচারকদের জেলা আদালতে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয়। তখন হাইকোর্ট ডিজিপি ভোরা, জেলাশাসক আর রঞ্জিৎ, জেলা পুলিশ সুপার ত্রিপুরারি এবং কোতয়ালি থানার আই সি প্রশান্ত চন্দকে বিচারকদের আদালতে প্রবেশের ব্যবস্থা

অনুপভূষণ ভোরা

করার নির্দেশ দেয়। হাইকোর্টের সেই নির্দেশ তাঁরা ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেন। এরপর আদালত অবমাননার দায়ে এইসব কীর্তিমান অফিসারদের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি ভাস্কর ভট্টাচার্য এবং বিচারপতি কে কে প্রসাদের ডিভিসন বেঞ্চ এইসব পদস্থ অফিসারদের জেল ও জরিমানার দন্ড দেয়। সুতরাং সুপ্রিম কোর্ট এই আদেশ বাতিল না করা পর্যন্ত তাঁরা সকলেই দন্ডপ্রাপ্ত আসামি। হাইকোর্টের শাস্তির বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে না গেলে অনুপভূষণ ভোরা সহ অন্যান্য দলদাস অফিসারদের জেলে যেতে হতো। সেক্ষেত্রে তাঁদের চাকরিও থাকতো না।

এখানেই ভোরা সাহেবের কীর্তি - কাহিনীর শেষ নয়। ২০০৭ সালের নভেম্বর অর্থাৎ হাইকোর্টে শাস্তি পাওয়ার ৯ মাসের মধ্যেই নন্দীগ্রামে 'নতুন সূর্যোদয়ের' জন্য সিপিএমের হার্মাদ বাহিনীকে সুযোগ করে দিতে তিনি সেখানের তেখালি সেতুর কাছে পুলিশ ফাঁড়ি সরিয়ে দেওয়ার হুকুম দেন। এরপর নন্দীগ্রামে কী ভয়াবহ অত্যাচার হার্মাদরা চালিয়েছিল সে কথা কারও অজানা নয়। পরে এই অত্যাচারের ঘটনার সরেজমিন তদন্ত চালাতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি প্রতিনিধি দল নন্দীগ্রামে পাঠায়। এই প্রতিনিধি দলের রিপোর্ট পাওয়ার পর কমিশন শাসক সিপিএম পার্টির সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগে ভোরার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করতে রাজ্য সরকারকে বলে। কিন্তু রাজ্য সরকার এই সুপারিশ মানেনি। উল্টে মুখ্যমন্ত্রী সদম্ভে পুলিশ কর্তাদের বলেছিলেন, ''ওসব হিউম্যান রাইট টাইট আমি বুঝে নেব। আপনারা আমাদের

(এরপর ৪ পাতায়)

অসত্য সংবাদ পরিবেশন

প্রেস কাউন্সিলের তীব্র কটাক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রাক্তন বিচারপতি জে এন রায় অর্থের বিনিময়ে অসত্য সংবাদ পরিবেশনের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ

সেমিনারে চন্দন মিত্র এবং অন্যরা।

করেছেন। এর ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন, সংবাদ পরিবেশনায় 'ভুল তথ্য' এবং 'মিথ্যে তথ্য' এই দুই নিকৃষ্টব্যাধি সংবাদমাধ্যমকেকলুষিত করেছে।

'লোকসভা নির্বাচনে মিডিয়ার ভূমিকা' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় বিচারপতি রায় তাঁর লিখিত বক্তব্যে বলেন, এটা আজ আর গোপন নেই যে লোকসভা নির্বাচনে হাজার হাজার ইস্যুর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে এ দেশের সংবাদমাধ্যম। আরও উদ্বেগের বিষয় হল, উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে অসত্য সংবাদ পরিবেশনও লক্ষ্য করা যাচ্ছে।' প্রসঙ্গত এই আলোচনা সভাটির আয়োজক ছিল মাখনলাল চতুর্বেদী ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশন। যদিও বিচারপতি শ্রী রায় নিজে নয়াদিল্লীতে আয়োজিত ওই সভায় উপস্থিত হতে পারেননি। তাই তাঁর লিখিত বক্তব্য পাঠ করা হয়।

শ্রী রায় আরও বলেছেন, বাজারীকরণ ও লাভের অঙ্ক বাড়ানোর যুগে সংবাদমাধ্যম তাঁর গ্রহণযোগ্যতা হারাচ্ছে। তিনি সেই সঙ্গে এও মনে করেন যে বাজারীকরণের ক্ষতিকারক দিকগুলি নিয়ে মিডিয়ার সোচ্চার হওয়া উচিত ছিল। উল্টে তারাই আজ সেই বাজারীকরণের ঢেউ-এ আন্দোলিত হচ্ছে।

পুরো ব্যবস্থার যে ত্রুটি রয়েছে তার দিক্ নির্দেশ করে সুপ্রিম কোর্টের ওই প্রাক্তন বিচারপতি বলেন, ''সাংবাদিকরা পুরো একটি 'প্যাকেজ'-এর মধ্যে কাজ করেছেন। সম্পাদকরাও তাতেই গা ভাসছেন এবং সম্পাদক নামে যে সম্মানজনক প্রতিষ্ঠানটি রয়েছে নিজেরাই তার অবমূল্যায়ন করে মর্যাদা হানি করছেন। সেই দিন আর নেই যখন একটি সংবাদপত্র তার সম্পাদকের নামে পরিচিত হত।''

দ্য পাইওনিয়ার পত্রিকার সম্পাদক ও রাজ্যসভার সদস্য চন্দন মিত্র লোকসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে জনসচেতনা বৃদ্ধিতে সংবাদমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ' ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। এই সভায় তিনি মন্তব্য করেছেন ''মিডিয়া জনসাধারণকে সচেতন করে তাদের বাইরে বেরতে ও ভোট দিতে যাওয়ায় ভূমিকা নিয়েছিল।'' তিনি নির্বাচনী সমীক্ষার একটি তাৎপর্য পূর্ণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে বলেন, ''সংবাদমাধ্যমের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত কয়েকজন প্রার্থীর পরাজয় সম্ভব হয়েছে।''

তবে একই সঙ্গে শ্রীমিত্র সংবাদ-মাধ্যমের প্রচারের নেতিবাচক দিকটাও তুলে ধরেন। তাঁর মতে এর জন্য দায়ী অর্থবান হওয়ার নিদারুণ প্রচেষ্টা এবং তার জন্য ভাঁওতাবাজি। তিনি আরও বলেছেন, মিডিয়া প্রায়শই জনগণের সেন্টিমেন্টকে ছোট করে দেখে, তার নিজের মতটা জনগণের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়।

প্রসঙ্গত, এবার ইউ পি এ আমলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, এমনকী দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিষয়টি দেশের সংবাদ মাধ্যম জনগণের সামনে তেমন ভাবে তুলে ধরেনি। একটি পরিবারের তিনজনের ওপরই মিডিয়া কেন্দ্রীভূত ছিল বলা যায়।

প্রায় সহমত পোষণ করে বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রভাস যোশী বলেছেন, গণতন্ত্রের অন্য তিনটি স্তম্ভের অতন্দ্র প্রহরী হল সংবাদমাধ্যম। তাঁর কথায়, ''এটা দুর্ভাগ্যজনক যে সংবাদমাধ্যম অর্থের দাসত্ব করছে এবং সেটা করছে সাংবাদিকতার নীতিকে দূরে সরিয়ে রেখেই।'' এতে সংবাদমাধ্যমের গ্রহণযোগ্যতা ক্রমশ তলানিতে এসে ঠেকছে বলে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

নতুন সরকার ভর্তুকি তুলছে দাম বাড়ছে ভোজ্য তেল ও ডালের

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। নির্বাচন সমাপ্ত, নতুন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণও করেছে। আর সেই সঙ্গে কেন্দ্র এতদিন ভোজ্য তেল এবং অড়হর ও ছোলার ডালের উপর যে ভর্তুকি দিত তা প্রত্যাহার করা হচ্ছে বলে রাজ্য সরকারগুলিকে চিঠি দিয়েছে। এই তেল ও ডাল বিতরণ করা হত সরকারি গণবন্টন ব্যবস্থা বা রেশন দোকানের মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় সরকারের উপভোক্তা, খাদ্য ও গণবন্টন মন্ত্রকের সচিব ওই চিঠি দিয়েছেন। চিঠিতে বলা হয়েছে ভর্তুকির সুবিধা এবার থেকে রাজ্যগুলো আর পাবে না। এমনকী দিল্লীর রাজ্য সরকারের কাছেও ওই চিঠি পৌঁছে গিয়েছে। চিঠিতে কেন্দ্রীয় গণবণ্টন মন্ত্রক জানিয়েছে যে, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চ ল এবং বিভিন্ন রাজ্য নানা কারণে কেন্দ্রের এই ভর্তুকি ব্যবস্থার লাভ তুলতে পারেনি এবং বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেনি। যদিও ২০০৮-এর নভেম্বর মাস থেকে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। রাজ্য সরকারগুলো ডালের চাহিদার বিষয়ে কেন্দ্রকে অবহিত করেনি বলে কেন্দ্রের অভিযোগ। ভোজ্য তেলে প্রতি কেজিতে ১৫ টাকা ভর্তুকি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল গত বছরের জুলাই মাস থেকে। এক্ষেত্রেও রাজ্য সরকারগুলো একই ভূমিকা নিয়েছেন। একথা কেন্দ্র সরকারের উপভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবণ্টন মন্ত্রকের চিঠিতে বলা হয়েছে। দিল্লী রাজ্য সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী হারুণ ইউসুফকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কেন্দ্রের চিঠি পাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। বলেছেন, রাজ্য সরকার চিঠির বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, দিল্লী রাজ্য সরকার কখনও কেন্দ্রীয় কোনও সংস্থার কাছ থেকে ভর্তুকি দেওয়া ভোজ্য তেল বা ডাল সংগ্রহ করেনি। সরকার তাদের নিজস্ব সূত্র থেকেই তা সংগ্রহ করেছে।

ইউসুফ-এর কথায়, শহরে যোগান পর্যাপ্ত এবং দামও স্থিতিশীল।

দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির কারণে কেন্দ্র ওই পদ্ধতি নিয়েছিল যা এবছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চালু থাকার কথা ছিল। কথা ছিল অড়হর ও ছোলার ডালে ২৫ শতাংশ ভর্তুকি দেওয়ার। রেশনে কম দামে তা পাওয়া যেত। রাজধানী দিল্লীতে ৪.৫৩ লক্ষ বি পি এল কার্ড আছে। আছে ৪৯ হাজার এ পি এল কার্ড। এদের সবাই বস্তিতেই বসবাস করেন, রেশন দোকান থেকে গম, চাল, চিনি পান। দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী এই ভরতুকির বিষয়টি নিয়ে আগামী বাজেট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চান।

যাই হোক, শিগগিরই ভোজ্য পণ্যের দাম আরও বাড়তে চলেছে। এখন ভোটে জেতার পর কেউই বলছেন না যে, এন ডি এ আমলে জিনিসপত্রের দাম এখনকার থেকে কত কম ছিল। আসলে আমজনতার স্মৃতিশক্তি বেশি দিন স্থায়ী হয় না।

মুজাহিদিন পাণ্ডারা এখনও সক্রিয়

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ভারতীয় মুজাহিদিনের কুখ্যাত জঙ্গিরা এখনও পুলিশের নাগালের বাইরে। তাদের অনেকেই আজও সক্রিয়। সক্রিয় রয়েছে রিয়াজ ভাটকালের মতো জঙ্গিও। যে ২০০৮-এর ১৩ সেপ্টেম্বর দিল্লীতে বিস্ফোরণের অন্যতম মাস্টার মাইন্ড ছিল। ১৩ সেপ্টেম্বরের বিস্ফোরণের পিছনে যে মুজাহিদিন জঙ্গি দেরই হাত ছিল, পুলিশ তদন্তে নেমে তার যথেষ্ট প্রমাণও হাতে পায়। শুধু তাই নয়, ওই বছরেরই ৩০ ডিসেম্বর সরকারিভাবে জঙ্গিদের মাথা পিছু ১ লাখ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। ওইসব জঙ্গিরা সেন্ট্রাল পার্কসহ দিল্লীর ৬টি পৃথক পৃথক এলাকায় বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এমন ১২ জন জঙ্গিদের মাথা পিছু এক লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়। পুলিশের হাতে কিছু জঙ্গি ধরা পড়লেও, অনেক জঙ্গি এখনও ফেরার। অনুমান করা হচ্ছে মুজাহিদিনের জঙ্গিরা সিমি ও পাকিস্তানী জঙ্গি গোষ্ঠী লস্কর-এ-তৈবার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। তাদের যৌথভাবে নতুন পরিকল্পনা করার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। গোয়েন্দা দপ্তরের বিশেষ সূত্র এমন সম্ভাবনার আভাস পেয়েছে।

১৩ সেপ্টেম্বর, ০৮-এর পর সব থেকে বড় জঙ্গি হামলা ঘটে গেছে ২০০৮-এ ২৬ নভেম্বর, মুম্বাইয়ে। গোয়েন্দা দপ্তর ও বিভিন্ন নিরাপত্তা বিভাগ এখনও ২৬/১১-র ঘটনার তদন্তে ব্যস্ত। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই নজরের আড়ালে থেকে যাচ্ছে ভারতীয় মুজাহিদিনরা। ২০০৪-এর পর থেকে এদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটা বিস্ফোরণের প্রায় সব কটিতেই মুজাহিদিনের যোগসাজস ধরা পড়েছে মুজাহিদিনের কয়েকজন জঙ্গি। যেমন মহম্মদ সৈয়ফ, জেশন আহমেদ, মহম্মদ শাকিল ওরফে জিয়াউল রহমান ও সকিউব নিশারের মতো জঙ্গিরা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তারও হয়েছে। এছাড়া এরপর আরও ৬ জঙ্গি দিল্লী পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। তবে এখনও বহু জঙ্গি পুলিশের নাগালের বাইরে, যারা পুলিশের খাতায় টপলিস্টে রয়েছে। এইসব জঙ্গিদের মধ্যে আছে আজিজ খান ওরফে জুনিদ, সাহাজাদ আহমেদ, মহম্মদ সাজিদ, মহম্মদ সালিম, আসাদুল্লা খান সহ একাধিক কুখ্যাত জঙ্গি।

মুজাহিদিনে জঙ্গিদের এভাবে ফেরার থাকা যথেষ্ট চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে নিরাপত্তা এজেন্সীগুলির কাছেও।

মুসলিম সাংসদের সংখ্যা কমে ২৯

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ওড়িশা — এই ছয়টি রাজ্য পঞ্চ দশ লোকসভায় একজন মুসলিম সাংসদকেও প্রতিনিধি হিসাবে পাঠায়নি। ২০০৯-এর নির্বাচনে মুসলিম সাংসদদের সংখ্যা ৩৬ থেকে কমে ২৯-এ দাঁড়িয়েছে। এযাবৎ লোকসভায় মুসলিম সাংসদদের সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল ৪৮ এবং সেটা ১৯৮০ সালে। কিন্তু ১৯৮৪-তে তা কমে দাঁড়িয়েছিল ৪১-এ। আর ১৯৯৯-এর নির্বাচনে তা আরও কমে হয়েছিল ৩২ জন। অবশ্য ২০০৪-এ মুসলিম সাংসদদের সংখ্যা একটু বেড়েছিল। এবারে নির্বাচিত মুসলিম সাংসদদের মধ্যে ৩ জন মহিলা সাংসদ। উল্লেখ্য, এইবারে লোকসভায় রয়েছেন মোট ৫৯ জন মহিলা সাংসদ।

সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু দপ্তরের মন্ত্রী এ আর আন্তুলে (কং), মহম্মদ সেলিম (সিপিএম), আবু আসিম আজমি (সপা), মুখতার আব্বাস নকভি (বিজেপি) এবং আকবর আমেদ ডাম্পি (বিএসপি)-র মতো মুসলিম নেতারা পরাজিত হয়েছেন। অন্যদিকে মহম্মদ সাহাবুদ্দিন, আকবর আনসারি, তসলিমুদ্দিন-এর মতো দাগি নেতাদেরও ভোটাররা বাতিল করে দিয়েছেন।

এই সময়

বিধি বাম

রীতিমতো বেকায়দায় পড়েছেন বিমান বসু। একদিকে দলের ভরাডুবি, অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর মন্ত্রিত্ব। দলের হ্যাভিওয়েট নেতারাও আঙুল তুলছেন তাঁর দিকে। ২৪ মে রাজ্য কমিটির বৈঠকে নেতাদের প্রশ্নের সামনে এক প্রকার নতজানু হতে হয় তাঁকে। শেষ পর্যন্ত বৈঠক স্থগিত রাখতে হয় দলের কান্ডারী বিমান বসুকে। ১১ জুন আবার বৈঠকের ডাক দেন তিনি। দলের বেশিরভাগ নেতাই তাদের পরাজয়ের পিছনে মুখ্যমন্ত্রী ও দলকে দায়ী করেন। অমিতাভ নন্দী, মহঃ সেলিমের মতো নেতারাও এদিন দলকে দায়ী করেন।

লৌহ মানব

আবারও একবার প্রকৃত নেতার পরিচয় দিলেন আদবানী। ভোটের ময়দানে কংগ্রেসের প্রতি তাঁর মন্তব্যে মিডিয়া রঙ মেশালেও, ২২ মে রাষ্ট্রপতি ভবনে শপথ গ্রহণের দিন, নিজেকে আরও একবার লৌহমানব রূপে তুলে ধরলেন তিনি। এদিন উপস্থিত কংগ্রেস নেতাদের প্রতি সৌজন্য দেখাতে কুণ্ঠাবোধ করেননি আদবানী। প্রায় সব নেতাদের সঙ্গেই কথা বললেন। নতুন মন্ত্রীদের অভিবাদনও জানান তিনি। হাততালিও দেন। আদবানীর এই সৌজন্যবোধ সভাগৃহে উপস্থিত নেতা - নেত্রীদেরও অবাক করে। অনেকে ফিস ফিস করে বলেন, 'সত্যিই লৌহ মানব'।

অবমাননায় না

জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননা রুখে দিলেন সুপ্রীম কোর্ট। বিশিষ্ট হিন্দি চিত্র পরিচালক রামগোপাল ভার্মার হাতে হতে চলেছিল এই অবমাননা। শীর্ষ আদালত তার রায়ে জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে ছেলেখেলা নয় বলে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন। ভার্মা তার আসন্ন 'রান' সিনেমায় — জনগণমন অধিনায়কের জায়গায় 'জনগণমন রান' শব্দটি ব্যবহার করেন। বিচারপতি ভি এস সিরপুরকার ও আর এম লোধ-এর ডিভিশন বেঞ্চ রামগোপালের মনোভাবকে নেতিবাচক মনোভাব বলে ভর্ৎসনা করেন।

সত্যের জয়

দলাই লামাকে ভিসা দিতে রাজি হল দক্ষিণ আফ্রিকা। দু' মাস আগে পূর্বতন কাগালেমা মতলানথে নেতৃত্বাধীন সরকার দলাই লামাকে ভিসা দিতে চায়নি। চীনের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে ধর্মগুরু দলাই লামাকে ভিসা দিতে অস্বীকার করে। কিন্তু সম্প্রতি ইন্ট্যারন্যাশনাল রিলেশনস এন্ড কো-অপারেশন মন্ত্রকের নয়া মন্ত্রী মাইতি নকাওণি মাশাবানিশি ভোল পাল্টে এতে রাজি হয়েছেন। ৭৩ বছর বয়সী নোবেল জয়ী দলাই লামার এই জয়কে অনেকে সত্যের জয় বলে মনে করছেন।

একা একা

পাশে পেলেন না কাউকে। একাই রক্ষা করতে হল কুম্ভ। ২২ মে, মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণের দিন দলের পক্ষে কেবলমাত্র সীতারাম ইয়েচুরি-ই উপস্থিত ছিলেন। নিমন্ত্রণ ছিল সবার। কিন্তু এদিন অন্য কোনও বামপন্থী নেতার মুখ দেখা যায়নি। অনেকের মতে, দলের ভরাডুবি থেকে মুখ ঢাকতেই কারাতরা উপস্থিত থাকেননি। অথচ এর আগে বামপন্থীরা কংগ্রেসের জোট সঙ্গী ছিল। কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে বামপন্থীদের এমন দৃশ্যেরও সাক্ষী হয়ে রইল রাষ্ট্রপতি ভবন।

সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য

সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য অনেক কিছুই হাতে রাখতে হয়েছিল নির্বাচন কমিশনকে। অনেক কিছু ব্যবহারও করতে হয়। ১৯ মে নির্বাচন কমিশন এমনই বহু তথ্য প্রকাশ করলেন, সাংবাদিকদের সামনে। বিশ্বের বৃহত্তম নির্বাচনের জন্য কমিশন চল্লিশ হাজার ছ'শ টি ডিজিট্যাল ক্যামেরা ব্যবহার করে। যদিও এগুলি স্পর্শকাতর এলাকাতেই ব্যবহৃত হয়। ভোট কর্ম সম্পাদনের জন্য ৪ লক্ষ সরকারি কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। নিয়োগ করা হয় ২১ লক্ষ নিরাপত্তা কর্মী। গণতন্ত্রের বৃহৎ উৎসবের জন্য এই সমস্ত আয়োজন অবশ্য রাখতেই হয় কমিশনকে।

১০-এর গন্ডি

এই প্রথম সংসদে মহিলা সংসদের সংখ্যা ১০ শতাংশ পার হল। সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের দাবি উঠলেও, তা আজও পাশ হয়নি। কিন্তু জনগণই জনাদেশে ১০ শতাংশ পার করে দিয়েছে এই সংখ্যা। প্রথম লোকসভায় মহিলা সংসদের উপস্থিতি ছিল ৪.৪ শতাংশ। এর পর থেকে কিছুটা সংখ্যা বাড়লেও, তা দশের ঘর পার করেনি। এই প্রথম ১০.৭ শতাংশ মহিলা সাংসদের সংখ্যা দাঁড়াল। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে অনেক মহিলার নতুন মুখও সংসদে জায়গা করে নিয়েছে। এবছর বাংলা থেকেও ৭ মহিলা সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৫ জনই নতুন।

বেহাল অবস্থা

রাজ্যে বেহাল অবস্থার পর অনেক কৌশলই হাতে নিতে হচ্ছে দলকে। পিছিয়ে নেই সরকারি দপ্তরও। রাজ্য সরকারের গ্রামোন্নয়ণ ও পঞ্চ ায়েত বিভাগ এমনই এক নতুন কৌশল হাতে নিচ্ছে। সম্প্রতি এক বৈঠকে দুই দপ্তর মিলে ঠিক করেছে ১০০ দিনের কাজের জন্য অর্থ দ্বিগুণ করা হবে। অথচ ১০০ দিনের কাজে সব থেকে বেশি দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল এ রাজ্যে। কাজ না পাওয়া থেকে, কাজ না হওয়া সব ধরনের অভিযোগই শোনা গেছিল। ভোটের ভরাডুবি থেকে গ্রামের মানুষকে আবার ফেরাতেই সরকারের এমন উদ্যোগ বলে বিরোধীদের অভিযোগ।

যুব এমপি

২৬/১১ ঘটনার পর থেকেই রাজনীতিতে যুব নেতৃত্বের কথা উঠে আসছিল বেশি করে। ১৫ তম লোকসভা অবশ্য কিছুটা আশার আলো দেখাচ্ছে। জনগণের ভোটে অনেক যুব সাংসদ জায়গা করে নিয়েছে ভারতীয় রাজনীতিতে। সংখ্যাটা আগের তুলনায় বেড়েছেও। ২৫ থেকে ৪০ বছর বয়সী সাংসদের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪২। এর মধ্যে ২৫ বছরের সংখ্যাটাও কম নয়। যার মধ্যে রয়েছে মহিলা সাংসদও। ভারতীয় রাজনীতিতে এটা শুভ লক্ষণ বলেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

অসমের অস্তিত্বের সঙ্কট ও কংগ্রেস

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের পরিকল্পিত অনুপ্রবেশ ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণে অসমের জাতীয়তাবাদী স্বদেশপ্রেমী মানুষ তো বটেই, এমন কী রাজ্যের উচ্চ আদালত পর্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে। অথচ রাজ্যের শাসকদল কংগ্রেস এবং মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ কিন্তু এই অনুপ্রবেশকারীদের পারিলে ধন্যবাদই দিয়া দিতেন এবারের লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের অব্যবহিত পরেই। কারণটা গত বছর বিচারপতি বি কে শর্মা নিজেই প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন যে বে-আইনী বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীগণ অসমে ইতিমধ্যেই এমন অবস্থায় পৌঁছাইয়াছে যে, তাহারা যে দলকে সমর্থন করিবে সেই দলই সরকার গঠন করিতে সক্ষম। অর্থাৎ অসমে অনুপ্রবেশকারীরাই 'কিং মেকার'। অসমের কংগ্রেস দলের কর্ণধার মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে এই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের তৈরি কংগ্রেসী ভোট ব্যাঙ্কের বিস্তার ও রক্ষা করিতে বড়ই উল্লসিত এবং অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত।

এবারের লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে বহুবার সন্ত্রাসবাদী হামলায় রাজ্যের বহু সাধারণ মানুষ প্রাণ হারাইয়াছে এবং তাহাদের সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। রাজ্যের মানুষ এই বে-আইনী অনুপ্রবেশকারীদের ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিল। এবং এই অনুপ্রবেশকারীদের মদতদাতাদের সমুচিত জবাব দিতে প্রস্তুতও ছিল। সারা দেশের মানুষ এক প্রকার নিশ্চিতই ছিল যে এবার এই অনুপ্রবেশকারীদের মদতদাতা কংগ্রেস দল সমুচিত জবাব পাইবে।

কিন্তু হা হতোস্মি! এবারও কংগ্রেস দল রাজ্যের বৃহত্তম দলই রহিয়া গেল। সকলকে অবাক করিয়া দিয়া কংগ্রেস ৭টি আসন লাভ করিয়াছে এবং বদরুদ্দিন আজমলের তৈরি গালভরা 'অসম ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট' লাভ করিয়াছে ১টি আসন। তবে ইহার মধ্যেও আশার কথা এই যে, ভারতীয় জনতা পার্টি অর্থাৎ বি জে পি সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ৪টি আসন লাভ করিয়াছে এবং তাহার জোট সঙ্গী অসম গণ পরিষদ লাভ করিয়াছে ১টি আসন। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের ভোট ব্যাঙ্কের উপর কংগ্রেস দলের মৌরসী পাট্টা কতদিন চলিবে ভগবানই জানেন।

কংগ্রেস দল এই বে-আইনী বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের সম্পর্কে কতটা সহানুভূতিশীল গৌহাটি হাইকোর্টের বিচারপতি বি কে শর্মা বেঞ্চে র দেওয়া রায় হইতেই তাহা পরিষ্কার। গত সপ্তাহেই গৌহাটি হাইকোর্ট বে-আইনী বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠাইতে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের সদিচ্ছা সম্পর্কেই প্রশ্ন তুলিয়াছে। অন্য দেশের নাগরিকদের নিজ দেশে ফেরৎ পাঠাইবার পথে নানান সমস্যার কথা তুলিয়া কেন্দ্র ও রাজ্যের কংগ্রেস সরকার বিষয়টিকে বছরভর ঝুলাইয়া রাখিয়া বিধানসভা ও লোকসভা ভোট বৈতরণী পার হইতেছে। এই বছর ৯ মার্চ এক বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী মামলার শুনানির সময় বিচারপতি বি কে শর্মা বেঞ্চ অসম সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারকে বে-আইনী অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিতকরণ এবং ফেরৎ পাঠানো সংক্রান্ত কতগুলি প্রশ্নের জবাব দিতে বলেন। রাজ্যের কংগ্রেস সরকার এবং কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার উভয়েই এই প্রশ্নগুলির জবাব দেওয়ার প্রয়োজনই মনে করে নাই। যেন বেআইনী অনুপ্রবেশ একটি জাতীয় সমস্যাই নয়। অসমের মূল অধিবাসীগণ আজ নিজ ভূমে নগণ্য সংখ্যালঘুতে পরিণত হইয়া পড়িতেছে — ইহা রাজ্য ও কেন্দ্র কোনও সরকারের উদ্বেগের বিষয়ই নহে। কেন এই উদাসীনতা?

রাজ্যের উচ্চ আদালত পুনরায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে আদেশ দিয়াছেন যে অবিলম্বে প্রশ্নগুলির জবানবন্দী জমা দেওয়ার জন্য। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। যে কংগ্রেস দল বি জে পি-কে আদালত না মানার জন্য রাত-দিন গাল-মন্দ করিতেই অভ্যস্ত তাহাদের এই আচরণ কেন? অবশেষে বিরক্ত বিচারপতি বি কে শর্মা বেঞ্চ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব এবং অসম স্বরাষ্ট্র কমিশনার মহাশয়কে ২০ শে মে আদালতে উপস্থিত হইয়া প্রশ্নাবলীর জবাব দিতে নির্দেশ দেন। নির্দিষ্ট দিনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের বদলে ডেপুটি সেক্রেটারী অজয় কানোজিয়া এবং রাজ্যের স্বরাষ্ট্র কমিশনার রাজীব বোরা আদালতে উপস্থিত হন। তাহারা জানান যে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স্ তাহাদের নাগরিকদের গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতেছে এই অজুহাতে যে ইহাদের ঠিকানা ঠিক-ঠাক নাই। বিচারপতিগণ স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেন এই সমস্যার সমাধান সরকার দ্রুততার সহিত সম্পন্ন করুক। পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেন ২-রা জুন।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে আজও অনুধাবন করিতেছেন না যে বিচারপতি শর্মার উদ্বেগ আসলে প্রত্যেক দেশভক্ত অসমীয়ার উদ্বেগ। আর এই সুযোগটাই গ্রহণ করিতে মাঠে নামিয়া পড়িয়াছে এ ইউ ডি এফ। বদরুদ্দিন আজমলের নেতৃত্বে গঠিত এই রাজনৈতিক দলটি অসমের অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষাকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। কংগ্রেস এবং তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী দলগুলি ইহার মধ্যে কোনও রকম সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পাইতেছে না। অথচ ঘটনা হইল বাংলাদেশ এবং সেদেশে তৎপর আই এস আই অসমের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাটি বাংলাদেশের সহিত জুড়িয়া দিয়া বৃহত্তর ইসলামি বাংলাদেশ গঠন করিতে চায়। এই কংগ্রেস যখন সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী (১৯৮৫) ছিল, তখনই আই এম ডি টি শুধু অসমের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে বলিয়া আইন পাস করিয়াছিল। এই বাস্তব সত্যটি কি কংগ্রেস অস্বীকার করিতে পারে?

জাতির প্রতি বিশ্বাস পুনরুদ্ধারের সময় হয়েছে

কাঞ্চন গুপ্ত

আমরা প্রায়ই ভারত সম্পর্কে ধারণার কথা শুনি বা পড়ি যাতে বলা হয় যে একশো কোটিরও বেশি মানুষের এই দেশ যেন একটি রঙিন প্রজাপতি, যা তার আকার ও আকৃতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করার প্রায় এক যুগ পরে এবং আধুনিক জাতি-রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশের ষাট বছর পরেও আমরা দেখছি যে এই জাতি-রাষ্ট্রটি কিছু ব্যক্তির তৈরি সংগঠনই হয়ে রয়েছে যারা সব সময় অস্বস্তি অনুভব করছে এই ভেবে যে এই জাতি-রাষ্ট্রটিতে হিন্দুরা ব্যাপকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ যেখানে জাতি-সত্ত্বা মূলতঃ হিন্দু মূল্যবোধ ও জীবন-প্রণালী দ্বারা গঠিত। তাই এই ধারণার ভিত্তিতে এদেশের জাতি-রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নিরুপণের উপর জোর দেওয়া হয় যা আজকের রাজনীতির পরিণতি এবং বাম রাজনীতিজ্ঞরা যা নির্ভুল বলে প্রচার করে।

প্রাচীন জাতি হিসেবে ভারতের পরিচিতি আধুনিক জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের অনুষ্ঠানের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি যা আমরা পালন করি প্রজাতন্ত্র দিবসে, আবার ভারত সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণার ভিত্তিতে চালু সংজ্ঞার মাপকাঠিতেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এমনকী ভারতের জনগণের মধ্যে যারা একই জনগোষ্ঠীভুক্ত নয় এবং ভাষাও বিভিন্ন তাদের বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে জাতীয়তাকে অস্বীকার করা হয়নি। কারণ ভারতীয় দৃষ্টিতে জাতি ও জাতিসত্ত্বা উভয়ই নিরুপিত হয় লক্ষ লক্ষ বছরের প্রাচীন সভ্যতার নিরীখে যাকে জওহরলাল নেহেরু প্রজ্ঞার সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন সংস্কৃতির সূক্ষ্ম বন্ধন হিসাবে যা বিভিন্ন অঞ্চল ও মানুষকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে।

বিদেশী উপনিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশের সময় ভারত সার্বভৌমত্ব ও ও গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসকে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছিল (সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষ কথাগুলি যোগ করা হয়েছিল অনেক পরে ইন্দিরা গান্ধীর অন্ধকারময় জরুরি অবস্থার দিনগুলির সময় ৪২-তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে)। কিন্তু ভারত তার নিজ পরিচিতি দিয়ে প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেয়নি কারণ তা আগে থেকেই আছে। তাকে ইতালির মতো ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাতি হিসাবে নিজের পরিচিতিকেপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়নি। আমাদের সার্বভৌমত্বের ঘোষণা কেবলমাত্র নতুন জাতি-রাষ্ট্রের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক গতিপথকেই সূচিত করেছিল যা প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতিক সভ্যতার সীমানা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তালিবানরা বামিয়ান বুদ্ধ মূর্তি ধ্বংস করে উল্লসিত হতে পারে, কিন্তু সেই বিকৃত উল্লাস এই সত্যকে মুছে ফেলতে পারেনি যে কান্দাহার ছিল একদা ভারতের সাংস্কৃতিক প্রান্তিক ঘাঁটি। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মতো ইসলামবাদীরা পর্যন্ত ভারতীয় সংস্কৃতির অবশিষ্টাংশ মুছে ফেলতে পারেনি। আর সিন্ধুনদ যেহেতু পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে সেই কারণে ভারতীয় সভ্যতার জন্মলগ্নের অতীত সাক্ষীকে অস্বীকারও করতে পারছে না। বৃটিশ সাম্রাজ্য পতনের সময় ইংরেজরা যেমন ইচ্ছে উইল করে দিয়েছে আর আমরা সেটাকেই সার্বভৌম ভারত রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নিয়েছি। আমাদের নপুংসক নেতারা ভারতীয় উপমহাদেশের নয়া সীমানা নির্ধারণকে নীরবে মেনে নিয়েছে 'দক্ষিণ এশিয়া' হিসাবে।

তার জন্য আমরা অতীতের সেই ভারতকে ফিরে পাওয়ার সামান্যতম আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশ করি না। অসংখ্য রাজত্ব, রাজন্যবর্গ ও রাজ্যকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছিল এই সাংস্কৃতিক বন্ধনের সূত্র যা ভারতীয় সভ্যতার ঐক্যের পিছনের মূল শক্তি। অখণ্ড ভারত একটি স্বপ্ন যা বিধির বিধানে এখনও অপূর্ণ রয়ে গেছে, যদিও এর প্রেরণাদায়ক মূল্য কখনও হ্রাস বা ক্ষয়প্রাপ্ত হবে না। তবে জাতি ও জাতীয়তাবোধ পুনরায় জাগাতে হবে, যুবকদের মধ্যে পুনরুত্থান ঘটাতে হবে। বিশেষ করে সেইসব বিপথগামী যুবকদের মধ্যে যারা নিজেদের 'বিশ্ব নাগরিক' হিসেবে তুলে ধরার জন্য লালায়িত হচ্ছে। কারণ আজকের ভারতের করুণ বাস্তবতা থেকে পালিয়ে যাওয়ার এইটাই তাদের কাছে একটা সুযোগ। আমাদের উচিৎ এদের বোঝানো যে একদা মহান এই জাতির মহত্ত্বকে তুলে ধরার মধ্যেই রয়েছে মুক্তি ও পরম কৃতিত্ব। একটা এইচ আই বি ভিসা জোগাড় করে অপর কোনও মহান দেশে বসবাস করার চেয়েও এটা মহান।

সর্বশেষে আমাদের কাজ হবে ওদের সাহায্য করা যাতে ওরা ভারতীয় জাতি ও জাতীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন সংজ্ঞা, বিভিন্ন অত্যুৎকৃষ্ট ধারণা পুনরাবিষ্কার করতে পারে যা একটা সর্বগ্রাহ্য পরিচিতি ও সমভাবের সৃষ্টি করে, যে ভাবনা যেন অনেক রঙের একটি কোলাজ, যার একটি অপরটি ছাড়া অসম্পূর্ণ। বিনায়ক দামোদর সাভারকর যেমন বলেছিলেন, "এক জাতি, এক জনগণ, এক সংস্কৃতি"। তার উদ্দেশ্য কখনই জোর করে এক করা ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল ভারতের অখণ্ড ভূমি ও তার জনগোষ্ঠীর একতার উপর জোর দেওয়া। তার কাছে ভারত তাই একই সঙ্গে পিতৃভূমি এবং পুণ্যভূমি। এই ভূমির একটি ভৌগোলিক পরিচিতি এমন এক উচ্চতায় উন্নীত করা তার উদ্দেশ্য ছিল যা সকলের স্বীকৃতি পাবে এবং জাতিকে সকলের উর্ধ্বে স্থাপন করার সংকল্প আদায় করে নেবে। বিশ্বাস করবে, বসবাস করবে এবং দেশের জন্য প্রাণ দেবে। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলার ঐতিহ্যপূর্ণ মা দুর্গাকে শক্তির প্রতিমূর্তি হিসাবে স্থাপন করে ভারতকে দেখেছেন মাতৃভূমি হিসেবে এবং ভারতের জনগণকে দেখেছেন এই মায়ের সন্তান হিসেবে যারা মাকে পূজা করে থাকে। 'বন্দে মাতরম্' ভারতীয় জাতি ও জাতীয়ত্ব সম্পর্কে এই ধারণাকেই বদ্ধমূল করেছে। একই রকম শক্তিশালী ধারণা ছিল রবীন্দ্রনাথের যিনি আমাদের এই ভূখণ্ডকে দেখেছিলেন জাতি হিসেবে যা বিবিধ অস্তিত্বকে অঙ্গীভূত করেও এক ভারত হিসেবে পরিচিত। 'জনগণমন' এই অঙ্গীভূত ঐক্যেরই সঙ্গীত অনুষ্ঠান।

দুঃখের কথা, আমরা আমাদের যুবকদের এসকল কিছুই জানাই না; জানাই না সাভারকরের পিতৃভূমি ও পুণ্যভূমি হিসাবে ভারতের চিত্তাকর্ষক বর্ণনার কথা, জানাই না বঙ্কিমের ভারতমাতার আধ্যাত্মিক প্রণম্য বর্ণনা অথবা রবি ঠাকুরের বিস্ময়কর ভারত গাথা। এদেশের নবীন প্রজন্ম শুধু জাতীয় সঙ্গীত যান্ত্রিকভাবে মুখস্থ করে আর অনিচ্ছার সঙ্গে গান করে। ইনফোসিসের মতো সংস্থা যারা সম্ভবত আধুনিক ভারতকে প্রচার করতে চায়, এমনকী তারাও এই সত্যকে আড়াল করে পাছে তা বিদেশী পর্যটকদের বিরক্তির কারণ হয়। সর্বত্র আজ ভারতীয়দের মধ্যেই এই বিরক্তি বেশি দেখা যাচ্ছে, জাতীয় সঙ্গীতে তারা কেবল ঠোঁট মেলায়, গান করে না। জাতি যে সূক্ষ্ম সংস্কৃতির বন্ধনে বাঁধা আছে সর্বত্র তারা আজ তাকে ছিন্ন করতে চায়। ভারতীয় হিসেবে তাদের দেশপ্রেম, দেশাভিমান আজ ত্রিবর্ণরঞ্জিত ফ্যাশনে দাঁড়িয়েছে। যদি তারা এম এস শুভলক্ষ্মীর বন্দেমাতরম্ শোনে, তাহলেই তারা বঙ্কিমের জাতি ও জাতীয়ত্বের শক্তি অনুভব করতে পারবে যা আমাদের একসূত্রে গেঁধে রেখেছে একক জনগোষ্ঠী হিসেবে।

এখন যেহেতু ওবামা হাওয়া বইছে, তাই বারাক হুসেন ওবামার আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পদে শপথ গ্রহণের সময় নেওয়া উক্তি উদ্ধৃত করা যুক্তিসঙ্গত হবে। তিনি বলেছিলেন, "আমরা এখন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাঝখানের সময় অতিবাহিত করছি। আমাদের জাতি এখন এই পরীক্ষার মুখে এবং আমাদের জনগণ জানে এই অনিশ্চয়তার কথা। তথাপি আমেরিকার ইতিহাস হল বিপদে ঘুরে দাঁড়ানো, অনৈক্যের সময় স্থির হয়ে পুনর্বিচার বিমর্ষ করা। এবং আমরা জানি যে স্বর্গের নীচে সব কিছুর পিছনে একটি কারণ

(এরপর ১৩ পাতায়)

> **"ইনফোসিসের মতো সংস্থা যারা সম্ভবত আধুনিক ভারতকে প্রচার করতে চায়, এমনকী তারাও এই সত্যকে আড়াল করে পাছে তা বিদেশী পর্যটকদের বিরক্তির কারণ হয়। সর্বত্র আজ ভারতীয়দের মধ্যেই এই বিরক্তি বেশি দেখা যাচ্ছে, জাতীয় সঙ্গীতে তারা কেবল ঠোঁট মেলায়, গান করে না। জাতি যে সূক্ষ্ম সংস্কৃতির বন্ধনে বাঁধা আছে সর্বত্র তারা আজ তাকে ছিন্ন করতে চায়। ভারতীয় হিসেবে তাদের দেশপ্রেম, দেশাভিমান আজ ত্রিবর্ণরঞ্জিত ফ্যাশনে দাঁড়িয়েছে।"**

পাছে সংখ্যালঘুরা ক্ষুণ্ণ হয়

ইন্দ্রমোহন উপাধ্যায়

কাগজে দেখলাম, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপুল জয়ে ও তাঁর রেলমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনায় বীরভূমে তাঁর মামার বাড়ির গ্রামের মানুষ পুজো দিয়েছেন স্থানীয় রক্ষাকালী মন্দিরে। রামপুরহাট-১ ব্লকের কুসুম্বা গ্রামের জাগ্রত দেবী এই রক্ষাকালী। তাঁর মন্দিরে মানত করেন কত না মানুষজন। মানত পূরণ হলে পুজো দেন। মামা অনিল মুখোপাধ্যায়ই শুধু নয়, ওই গ্রামের আরও অনেক বাসিন্দাই নাকি তাঁদের আদরের ভাগনির সাফল্যের জন্য ভোটের আগেই মন্দিরে মানত করেছিলেন। মা রক্ষাকালী তা পূরণ করায় সকলেই খুশি। ধুমধাম করে পুজো তো দিয়েছেনই, সকলে চাঁদা তুলে পঙ্‌ক্তি ভোজও করিয়েছেন। তখনও অবশ্য মমতার মন্ত্রিত্বলাভের ঘোষণা হয়নি। তাই সেই কামনাতেও গ্রামবাসীরা দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছেন। আর গ্রামের ভাগনির জন্য সকলেই চেয়েছেন, রেলমন্ত্রীই যেন তিনি হন, ভাল কাজ করে কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে নজর-কাড়া সাফল্য অর্জন করুন। মমতার মঙ্গল কামনায় তারাপীঠেও বিশেষ পুজোর ব্যবস্থা করেন মন্দিরে সেবাইতরা। অবশ্য শুধু মমতা নয়, এই পুজোয় বীরভূমের সন্তান প্রণব মুখোপাধ্যায়েরও কল্যাণ কামনা করেছেন তারাপীঠ মন্দির কমিটি। প্রণববাবুর জন্য পুজো দেওয়া হয়েছে বীরভূমের আরও অনেক মন্দিরেও। কীর্ণাহারে বাড়ির গৃহদেবতা তো আছেনই। তিনি ঠিকমতো পুজো পেয়েছেন কি না, মন্ত্রিসভা গঠনে দলে 'ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট' করার ফাঁকেই দিল্লী থেকে খোঁজ নিয়েছেন। জঙ্গিপুরে মনোনয়নপত্র দাখিলের আগেও কীর্ণাহারে গিয়ে গৃহদেবতাকে প্রণাম করে এসেছিলেন তিনি। জুবুটিয়ায় যে জপেশ্বর মন্দিরের জীর্ণোদ্ধারে তিনি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন, সেখানেও বাবা জপেশ্বরের মাথায় ১০৮ বেলপাতা চাপিয়ে প্রণববাবুর সাফল্য ও মঙ্গল কামনায় বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়।

পাঠকেরা বলবেন, এ তো ভাল কথা। এমনটা হওয়াই তো স্বাভাবিক। ভালোর জন্য কামনায়, ভাল কিছু হলে, মানুষ তো ঠাকুরকেই পুজো দেয়। প্রণববাবুর কথা জানি না, কিন্তু এসব একেবারেই না-পসন্দ মমতার। দিল্লীতে বসেই এসব 'পুজো-টুজোর' খবর পেয়ে যান তিনি। শোনেন, কিছু কিছু জায়গায় তাঁর দলীয় কর্মীরা নেত্রীর মঙ্গল কামনায় যাগযজ্ঞের আয়োজন করছেন। খড়দহে মহা ধুমধামে সি পি এম বিনাশ যজ্ঞও হয়ে গিয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গড়ায় ব্রতী নেত্রী সঙ্গে সঙ্গে কালীঘাটের বাড়ির কন্ট্রোল রুমে বার্তা পাঠালেন, ''সংখ্যালঘুদের ভাবাবেগের কথা মাথায় রেখে তাঁর এবং দলের এম পি'দের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান উপলক্ষে মন্দিরে পুজো দেওয়া বা যজ্ঞ করা থেকে তৃণমূল কর্মীরা যেন বিরত থাকেন।'' (দ্রষ্টব্য : বর্তমান, ২২ মে)। পাঠক, অবাক হচ্ছেন? এই কলমচি কিন্তু এতে মমতার সততার তারিফ না করে পারছেন না। কেননা, কে না জানে, মমতা ও তাঁর দলের এবারের এই অভূতপূর্ব সাফল্য সংখ্যালঘুদের ভোটের জন্যই। সংখ্যালঘুরা সরে না এলে সি পি এমের পালের হাওয়া এমনভাবে কেড়ে নেওয়া কোনওমতেই সম্ভব হত না। সংখ্যাগুরুরা তো বহুধা বিভক্ত। তাদের উপর বেশি নির্ভর করা মানেই ভরাডুবি হওয়া। যেমন হয়েছে বিজেপি-র। 'সকলের প্রতি ন্যায়, কাউকে তোষণ নয়' স্লোগানে তারা না পেরেছে হিন্দুদের আপন হতে, না পেরেছে সংখ্যালঘুদের কাছে টানতে। কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমে অচেতন হিন্দুদের জাগানো যে নিতান্তই দুঃসাধ্য কাজ, সেটা এতদিনেও তারা বোঝেনি। প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশায় হাতে হাতেই তো তার প্রমাণ মিলল। কন্ধমাল নিয়ে হালে চকিত জাগরণের পরক্ষণেই আবার কেমন গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল সেখানকার 'জাগ্রত হিন্দুসমাজ'! রাজ্যের অন্য জায়গার কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, খোদ কন্ধমালের আসনটিও জুটল না ভারতীয় জনতা পার্টির। সান্ত্বনা কেবল সেখানকার দু'টি বিধানসভা আসনে জয়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। জানতেন সি পি এম বিরোধী হিন্দুদের ভোটের সিংহভাগও যদি তিনি পান, তাহলেও জেতা যাবে না। সংখ্যালঘু ভোট পেতেই হবে। অতএব ওই 'ভোট ব্যাঙ্ক' বাগানোর দৌড়ে সবার আগে থাকতে হবে তাঁকে। বিজেপি-র সঙ্গে গিয়ে যে 'ভুল' করেছেন তা ধুয়ে মুছে সাফ করে সংখ্যালঘুদের আপনজন হয়ে উঠতে হবে। এই কলমচির মনে পড়ছে, বছর আটেক আগে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের মুখে সাংবাদিক উদয়ন নাম্বুদ্রি'র লেখা পশ্চিমবঙ্গে সি পি এমের সন্ত্রাস নিয়ে একটি বই প্রকাশের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল কলকাতার বিড়লা সভাগারে। বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানী ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বইটি উন্মোচন করার জন্য সেখানে হাজির। অনুষ্ঠানের সূচনায় মা সরস্বতীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য দেওয়ার জন্য ঘোষক যখন অতিথিদের আহ্বান জানালেন, মমতাও উঠে গিয়ে থালায় রাখা কিছু ফুল তুলে নিলেন। প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে আসনে ফিরতে যাবেন এমন সময় উদ্যোক্তাদের একজন একটি মালা নিয়ে এসে অনুরোধ করলেন, সেটি সরস্বতীর গলায় পরিয়ে দিতে। সেই অনুরোধকে আমল না দিয়ে মালাটি হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে ঝড়ের গতিতে মঞ্চে আসন নিলেন। মঞ্চে -বসা সকলেই বারংবার অনুরোধ করলেও কর্ণপাত করলেন না তিনি। মমতা ও আদবানীজীর আসন নির্দিষ্ট ছিল পাশাপাশি। কিন্তু মমতা গিয়ে বসলেন অন্য একটি আসনে, আদবানীজীর সঙ্গে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে।

দেখে-শুনে

উদ্যোক্তা ও সাংবাদিক-ফটোগ্রাফারদের শত অনুরোধেও মমতা নির্দিষ্ট আসনে ফেরেননি। সরস্বতীর ছবিতে মালা দিলে বা আদবানীর পাশে বসলে পাছে কেউ (পড়ুন সংখ্যালঘুরা) তাঁকে সাম্প্রদায়িক বলে, সম্ভবত সেই কারণেই তিনি সেদিন এমনটা করেছিলেন। অথচ বিজেপি ও তৃণমূল সেই নির্বাচনে জোট বেঁধেই লড়েছিল। সংখ্যালঘুদের কাছে টানতে কী না করেছেন মমতা। বোরখা পরে নমাজ পড়েছেন; পবিত্র রমজান মাসে উপবাসের কষ্ট ভোগ না করেও উপবাস ভঙ্গের ইফতারে খাওয়া-দাওয়া করেছেন, তসলিমা নাসরিনের কাটা মুণ্ডু এনে দিলে লাখো টাকার ইনাম দেব — টিপু সুলতান মসজিদের ইমামের এমনতর ঘোষণায় নিশ্চুপ থেকেছেন শুধু নয়, সংখ্যালঘু ভোট জোগাড়ে তাঁকেই দলে কাণ্ডারী করেছেন; মুসলিম-গরিষ্ঠ অঞ্চল বলে নন্দীগ্রামে জান লড়িয়ে দিয়েছেন (দুর্জনেরা বলে, সিঙ্গুরে হিন্দুরা গরিষ্ঠ বলে জমি অধিগ্রহণের গোড়ার দিকে ও শেষে তেড়েফুঁড়ে নামলেও মাঝখানে দীর্ঘ সময় ঢিলে দিয়ে টাটার কারখানাকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দিয়েছেন); হাতিয়ার করেছেন রিজওয়ানুর কাণ্ডকে; রা কাড়েননি তসলিমা বিতাড়নে; সাচার রিপোর্ট নিয়ে অতিমাত্রায় সরব হয়েছেন; সংখ্যালঘুরা বঞ্চিত বলে সর্বত্র উচ্চকণ্ঠ হয়েছেন। আরও কত কী তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই।

আসলে সংখ্যালঘুদের তুষ্ট করার কোনও সুযোগকেই মমতা হাতছাড়া করেননি। কোনও কাজে সংখ্যালঘুদের ক্ষুণ্ণ হওয়ার সামান্য সম্ভাবনা থাকলে তিনি সে পথে পা বাড়াননি। অতএব জয়ের উল্লাসে পুজো-আচ্চা, যাগ-যজ্ঞের মতো 'হিন্দু সাম্প্রদায়িক আচরণ' যে তিনি কিছুতেই মেনে নেবেন না তাতে আর আশ্চর্য কী! প্রখ্যাত সাহিত্যিক সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষ একবার 'স্বস্তিকা'র পুজো সংখ্যায় লিখেছিলেন, সত্য যে, জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তোষের কারণে সাতাত্তরের নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর কংগ্রেসী সরকারের পরাজয় ঘটেছিল। কিন্তু তারও চেয়ে বড় সত্যটা হল, সঞ্জয় গান্ধীর 'নাসবন্দি' অভিযানে রুষ্ট মুসলমান সমাজ দেশজুড়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সেবার ভোট দিয়েছিল বলেই জনতা পার্টির বিপুল জয় সম্ভব হয়েছিল। সংখ্যালঘুদের একজোট হয়ে ভোট দেওয়ার প্রবণতার আজও তেমন বদল হয়নি। অতএব তাদের তোয়াজে রাখতে রাজনৈতিক দলগুলির চেষ্টার অন্ত থাকে না। যদিও কে না জানে, সে সবের প্রায় ষোল আনাই 'লিপ সার্ভিস', প্রকৃত কল্যাণকর্ম নয়। দরদ যদি নিখাদ হতো, মুসলিম সমাজের পিছিয়ে পড়া দশা কবেই ঘুচে যেত। আসলে সমস্যা জিইয়ে রেখে 'ভোটব্যাঙ্ক' অটুট রাখতেই তৎপর সব পক্ষ। তোয়াজের এই দৌড়ে পান থেকে চুন খসলেই যে বিপদ, মমতা সেটা বিলক্ষণ বোঝেন। ভোটের প্রচারে বেরিয়ে বড়বাজারে হনুমান মন্দিরে চরণামৃত খেয়ে ও কপালে তিলক কেটে 'সেকুলারি' দেখাতে গিয়ে স্বধর্মীদের কাছে কী হালটাই না হল মহম্মদ সেলিমের! সাবধানী মমতা বিধানসভা নির্বাচনের আগে কোনও ঝুঁকি নিতে চান না। তাই বিজয় উপলক্ষে পুজো-আচ্চা, যাগযজ্ঞ করার উপর তাঁর এই নিষেধাজ্ঞা। তবে সংখ্যালঘুরা যদি তাঁদের কোনও ধর্মীয় সমাবেশে বা জলসায় বিজয়োল্লাস করেন, তাতে বোধহয় তিনি আপত্তি করবেন না, কেননা সংখ্যাগুরুদের ভাবাবেগ তো আর অত সহজে ক্ষুণ্ণ হয় না।

এসব সত্ত্বেও এই কলমচির একথা স্বীকার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই যে, এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাট থেকে সি পি এম-কে উৎখাত করতে পারেন একজনই, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অনুপভূষণ

(১ পাতার পর)

নির্দেশমতো কাজ করবেন।''

ভিজিলেন্স কমিশনের একমাত্র কাজ সরকারি প্রশাসনের সর্বস্তরে দুর্নীতি দমন করা। কমিশনের প্রধান পদটি প্রথম থেকেই আই এ এস অফিসারদের জন্য চিহ্নিত ছিল। এর একটা কারণ এই যে, আই পি এস ক্যাডারের পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে দুর্নীতির অভিযোগ থাকে। জ্যোতিবাবুর সময়েও এই নীতিই অনুসরণ করা হয়েছিল। মাত্র একবারই এই পদে হায়ার জুডিশিয়াল সার্ভিসের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে কমিশনের চেয়ারম্যান করা হয়। জ্যোতি জমানার শেষে বুদ্ধ জমানার শুরু থেকেই দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান পদটি দলদাস আই পি এস অফিসারদের কব্জায় চলে যায়। দুর্নীতি দমন নয়, কমিশনারের কাজ এখন দুর্নীতি আড়াল করা। বুদ্ধদেববাবুর নেতৃত্বে উন্নততর বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভিজিলেন্স কমিশন একজনও পদস্থ সরকারি আমলাকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করেনি। প্রশাসনের নীচুতলায় দু'চারজন কর্মীর বিরুদ্ধে শাস্তি দেওয়ার সুপারিশ করেছে। সেক্ষেত্রেও দেখা হয়েছে অভিযুক্ত কর্মী বামদলের সমর্থক কিনা। সমর্থক হলে সব অপরাধ মাফ।

মুসলিম তোষণ

(১ পাতার পর)

হিন্দু অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ। আগামী দু'বছরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচার করে হিন্দুরা তাদের নিজস্ব ক্ষোভের প্রকাশ করতেও শুরু করেছে।

এ রাজ্যের সিপিএম তৃণমূল-কংগ্রেসের মনে রাখা উচিত, মানুষ কিন্তু বোকা নয়। হিন্দুরা দু'হাত ভরে ভোট না দিলে বিরোধীরা সিপিএমকে হারাতে পারত না। এই সহজ সত্য যেন মনে থাকে।

পঞ্চদশ লোকসভায় ১৫০ জন দাগী সাংসদ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। জয়ী প্রার্থীদের নথিপত্র যাচাই করার পর দেখা যাচ্ছে, ২০০৪-এর চতুর্দশ লোকসভার তুলনায় এবার পঞ্চদশ লোকসভায় ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত দাগী সাংসদদের সংখ্যা ২২ শতাংশ বেড়েছে। এবারে নির্বাচিত ১৫০ জন সাংসদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। আবার ৭৩ জন সাংসদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। 'ন্যাশনাল ইলেকশন ওয়াচ' নামে একটি গোষ্ঠীর নির্বাচনী ফলাফল সমীক্ষায় এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। এই অভিযুক্তদের মধ্যে বিজেপির সাংসদদের সংখ্যা ৪২, কংগ্রেসের ৪১, এস পি-র ৮ এবং বি এস পি-র ৬ জন।

সব থেকে বেশী দাগী সাংসদরা নির্বাচিত হয়েছেন উত্তরপ্রদেশ থেকে — ৩১ জন। এরপর মহারাষ্ট্র — ২৩। এই দাগী সাংসদদের সংখ্যা বিহারে — ১৭, অন্ধ্রপ্রদেশে — ১১, কর্ণাটকে — ৯ এবং পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুতে ৭ জন করে।

রাজ্য রাজনীতি

বিমান দেওয়ালের লিখন পড়তে পারেননি

নিশাকর সোম

নিশাকর সোম ।। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল সকলেই জানেন। তাই সেই সব সংখ্যাতত্ত্ব দিচ্ছি না, তবে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল দৃষ্টে দেখা যাচ্ছে, ১৯৮টি বিধানসভা ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট শোচনীয় ভাবে পিছিয়ে আছে। নির্বাচনের এই ফলাফল কেন হল? এক কথায় বলে দিচ্ছেন অনেকে— পার্টি কর্মীদের ঔদ্ধত্য! সিপিএম-এর নেতৃত্বও তো এই কথাই বলছেন — "নিচের তলার কর্মীরা ঠিকমতো স্ক্রুটিনি করেনি।" বিনীতভাবে পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এই কলামে একাধিকবার লেখা হয়েছিল যে সিপিএম-এর নিচের তলার কর্মীরা জনগণকে তাঁদের "আজ্ঞাবহ দাস" মনে করতেন।

এই প্রসঙ্গে অনেক বছর আগের ঘটনা মনে করছি। সিপিএম বহু পথসভার ব্যবস্থা করেছিল। রিপোর্টার হিসাবে একটি পথসভায় যাই। সেখানে বলি রিপোর্ট নিতে চাই। সেখানে জনৈক ব্যাঙ্ক নেতা — কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য বললেন, "আমাদের রিপোর্ট না নিলে তো খবরই পাবেন না। আমরা তো ক্ষমতার শীর্ষে।' আসলে নিচের তলার কর্মীদের কোনও দোষ নেই। মহাজ্ঞানী (?) মহাজন যে পথে করেছেন গমন, সেইপথ ধরে তাঁদের কীর্তির ধবজাধারী কর্মীরাও হয়েছেন বরণীয়? জনগণকে তুচ্ছ করা, সাংবাদিকদের তুচ্ছ করা — এ সবই জ্যোতি বসুর আমল থেকে সৃষ্টি। জ্যোতি বসু সাংবাদিকদের বলতেন, "আমাকে শেখাবেন না।" আমি লেনিন-এর 'স্টেট অ্যান্ড রেভ্যুলেশন" পড়েছি।" যখন প্রবীণ মন্ত্রী বিনয় চৌধুরি, যাঁর নামের সঙ্গে আচরণের মিল ছিল — তিনি বলেছিলেন — "প্রমোটার ঠিকাদারদের স্বার্থে সরকার।" তখন জ্যোতি বসু প্রকাশ্যেই বলেছিলেন "তিনি অর্থাৎ বিনয়বাবু তবে কেন মন্ত্রিসভায় আছেন।" পক্ষান্তরে প্রমোটাররাজকেই জ্যোতি বসু সমর্থন করেছিলেন। তখন থেকেই গ্রামে-গঞ্জে প্রমোটার রাজ গড়ে ওঠে এবং প্রমোটারদের আর্থিক দাক্ষিণ্যে পার্টির কিছু নেতা ফেঁপে ফুলে ওঠে। গ্রাম-গঞ্জের মানুষ এটা লক্ষ্য করেন। কিছু বলতে সাহস করেনি। কারণ ম্যাসলরাজ চলছিল।

কাজেই ঔদ্ধত্য সৃষ্টি নেতারাই করেন। যেমন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন "আমারা ২৩৫ ওরা ৩৫। আমি দেখতে চাই ওরা কি করতে পারে? আমি পার্টি সদস্যদের বলে দিয়েছি মার খেয়ে ফিরে আসা চলবে না।" এর অর্থ মার কা বদলা মার। সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা কি এখন উল্টোভাবে ঘটতে পারে না?

এবার বর্তমান নির্বাচনের আগের পটভূমিটা একটু দেখা যাক। দীর্ঘদিন ধরে গ্রামের মানুষের পানীয় জল, স্বাস্থ্য, কর্মজীবিকা অবহেলিত। শহরের বিভিন্ন হাসপাতালের অব্যবস্থা। ডেঙ্গু, বার্ড ফ্লু, ম্যালেরিয়া, চিকুনগুনিয়ার উৎপত্তি নির্মূল করতে সরকারের যে তৎপরতা দেখানোর দরকার ছিল তা দেখানো হয়নি। এমনকী মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ বাবুও স্বাস্থ্য পরিষেবার সমালোচনা করেছিলেন।

বিমান বসুর বিভিন্ন সভায় উক্তি, বিশেষ করে উলুবেড়িয়াতে তিনি বলেছিলেন "বিরোধীরা দেওয়ালের লিখন পড়তে পারছে না।" আসলে বিমান বাবুরাই দেওয়ালের লিখন পড়তে চরম ব্যর্থ

শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ঢাকা হয়েছিল পরীক্ষার্থীর সংখ্যার ফিরিস্তি দেখিয়ে। অথচ সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে পাসের হার কমে যেতে লাগলো। কৌশল করে জেলা-গুলিতে উচ্চস্থান অধিকার করা দেখিয়ে চমক সৃষ্টি করা হল।

এমনকী নিরক্ষতা দূরীকরণের কর্মসূচীর মধ্যে জল মেশানো হল। মেদিনীপুর জেলাকে সাক্ষর ঘোষণা করা হল। এখানেও বুদ্ধ বাবু সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু এই বিষয় সম্পর্কে কোনও ব্যবস্থা নেবার সাহস ছিল না।

বুদ্ধ বাবুর নিজের তাঁবের দপ্তর পুলিশ। সম্পূর্ণ ব্যর্থ — তাঁদের ব্যর্থতার ফলেই লালগড় সৃষ্টি হয় আর ৪০ হাজার লোক ভোট দিতে পারেন না। তৈরি হয় মাওবাদী, তৈরি হয় ছত্রধর মাহাতো। পুলিশকে জরিমানা দিতে হয়, পুলিশকে ক্ষমা চাইতে হয়। ছত্রধর মাহাতোর শাসন আজও চলছে লালগড়ে। ব্যর্থ গোয়েন্দা বিভাগ। খালি আর এস এস আর স্বস্তিকাতে ওয়াচ বসানোই এক বিরাটকৃতিত্ব!

ইতিমধ্যে দু'টি ঘটনা চাঞ্চ ল্যকর — (১) সিপিএম-এর রাজ্য দপ্তরের প্রবীণ কর্মী সুশীল চৌধুরীর হত্যা। (২) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা মনীষা মুখার্জীর অন্তর্ধান। এখানেও পুলিশ ব্যর্থ।

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে হেলে সাপ ধরতে পারে না কেউটে ধরতে যায়। শিল্পায়ন নিয়ে বুদ্ধ বাবু একাই মরিয়া হলেন। পার্টির কর্মসূচীর মধ্যে জল মেশানো হল। মেদিনীপুর জেলাকে সাক্ষর ঘোষণা করা হল। এখানেও বুদ্ধ বাবু সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু এই বিষয় সম্পর্কে কোনও ব্যবস্থা নেবার সাহস ছিল না।

বুদ্ধ বাবুর নিজের তাঁবের দপ্তর পুলিশ। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীকে জানালেন না — রাজ্য কমিটিতে আলোচনা হল না — নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর হল।

রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর তথা কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য গৌতম দেব বলে ফেলেন "আমি কি সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আছি? বুদ্ধ বাবুর মন্ত্রিসভার অন্যতম প্রবীণ সদস্য সি পি আই মন্ত্রী নন্দগোপাল ভট্টাচার্যকে কড়া কথা শোনান। নন্দবাবুও ধীরে ধীরে আর এস পি ফরওয়ার্ড ব্লককে নিয়ে মিনি ফ্রন্ট গড়ে ফেললেন। শোনা কথা, নন্দবাবুর সঙ্গে মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর নাকি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

সুভাষ চক্রবর্তী তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণ' জ্যোতি বসুর প্রেরণায় দিনের পর দিন পার্টির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতেন এবং কাজ করতেন। তিনি ফল পেলেন — প্রোমোশন পেয়ে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে স্থান অধিকার করলেন!

সিঙ্গুর-এর শিল্প কারখানা করার জন্য জেলা কমিটিকেও জানানো হয়নি। এর উপর হলদিয়াতে বুদ্ধ বাবুর সমর্থনে লক্ষ্মণ শেঠ জমি অধিগ্রহণের একটি নোটিশ জারি করলেন। যখন সমালোচনা শুরু হল তখন বুদ্ধ বাবু কৌশলে বললেন, ওই বিজ্ঞপ্তি ছিঁড়ে ফেলে দিন। আশ্চর্য, সরকারি বিজ্ঞপ্তি ছিঁড়ে ফেলে দিতে বলছেন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী!

নন্দীগ্রামে পুলিশ দু'মাস পরে ঢুকলো। ইতিমধ্যে বিরোধীদের শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ দেওয়া হল।

নন্দীগ্রামের পুলিশি অভিযান সম্পর্কে সিপিআই ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর এস পি যৌথ সভা করে ঘোষণা করেছিল — "নন্দীগ্রামের ঘটনার দায়িত্ব সিপিএম-এর।" আর এস পি নেতা ক্ষিতি গোস্বামী বলেন — "পুলিশের উর্দ্দি পরে সিপিএম-এর ক্যাডাররা গুলি চালিয়েছে।" একথা ক্ষিতিবাবু নির্বাচনের ৪৮ ঘন্টা আগেও বলেছেন।

(এরপর ৭ পাতায়)

অন্য রকম

গ্রামীণ 'বি' স্কুল

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গতানুগতিক পরিকাঠামো তাদের জানা নেই। জানা নেই দামি প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা। আধুনিকতার সংজ্ঞাটাও তাদের অজানা। অজানা টেকনোলজির বিভিন্ন তত্ত্বও। তবুও তাদের এক একজন প্রযুক্তিতে পারদর্শী। পারদর্শী আরও অন্যান্য শিক্ষাতেও। মহারাষ্ট্রের সাতরা গ্রামের মহিলারা গ্রামে থেকেও, আধুনিক শিক্ষার অনেক পাঠই তাদের শেখা হয়ে গেছে। তাও হাতে কলমে। পুঁথিগত নয়। এসবই সম্ভব হয়েছে গ্রামীণ 'বি স্কুলের' দৌলতে। প্রযুক্তির অভিধানে গ্রামীণ 'বি' স্কুলের ঠাঁই নেই ঠিকই। কিন্তু তাদের কাছে এর মূল্য কোনও অংশে কম নয়।

এক আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের দৌলতে এই স্কুল গড়ে ওঠে। শুরুর দিকে শিক্ষানবীশ কম থাকলেও, এখন সংখ্যাটা রেকর্ড পরিমাণ। ৩২৫ জন মহিলা বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষায় ব্যস্ত। ৩২৫-র অনেকেই গ্রাম্য গৃহবধূ। সেদিক থেকে তাদের সংখ্যাটাই বেশি। 'বি' স্কুলেই শেখানো হয় প্রযুক্তির বিভিন্ন দিকের সঙ্গে সঙ্গে সব্জি ব্যবসার মতো বিষয়ও। যাতে তারা নিজের পরিবার চালানোর মতো আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন হয়। সংসারের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরেও আজ তারা স্বাবলম্বী। প্রযুক্তির খুঁটিনাটির সঙ্গে পরিচিত। পরিচিত ব্যবসার আধুনিক পঠন-পাঠনের সঙ্গে। গ্রামের বেশিরভাগ বধূরই স্কুলের দৌলতে জীবনে নতুন মোড় এসেছে। জীবনের চলার পথটা সেজন্যই থমকে যায়নি। আধুনিক পাঠের এই সাধনায় তারা সফল।

গ্রামের বধূরাই নিজেদের উদ্যোগে গড়ে তুলেছে 'কেবল'-র ব্যবসা। লোকের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে 'কেবল'র সুবিধা। গ্রামের মানুষও তাদের কাজে গর্বিত। যে রাঁধতে পারে, সে চুলও বাঁধতে পারে' কথাটার সার্থক রূপ দিয়েছে তারা।

গ্রামীণ বি-স্কুলের জন্য গ্রামীণ বধূরা নতুন নতুন শিক্ষায় শিক্ষিতা। সেখানে থেকে অনেক কিছুরই শেখার সুযোগ হয়েছে তাদের। সব্জি ব্যবসা থেকে টেকনলজির বিভিন্ন পাঠের শিক্ষা। গ্রামীণ বি-স্কুলের কোনও আভিধানিক সংজ্ঞা নেই ঠিকই। তবুও বাস্তবের পাঠটা এখানে ভালো করে শেখানো হয়।

হাতের কাজে ব্যস্ত গ্রামের মহিলারা।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল

উত্তর কাছাড়ে জঙ্গি দৌরাত্ম্য চলছেই
শিলচর-লামডিং ট্রেন চলাচল বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। আবারও অসমের উত্তর-কাছাড় পার্বত্য জেলাতে অশান্তি শুরু হয়েছে। প্রায় একমাসেরও বেশি সময় ধরে শিলচর-লামডিং লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ২/১ বার ট্রেন চালানোর চেষ্টা হয়েছিল। তাতে ডিমা হালাম দাওগা (গার্লোসা) জঙ্গি গোষ্ঠীর হাতে বেশ কয়েকজন যাত্রী ও নিরাপত্তা কর্মী হতাহত হন। এঘটনা ঘটেছে এপ্রিলের মাঝামাঝি। ১৬ এপ্রিল পরীক্ষামূলকভাবে মালবাহী ট্রেন চালানো হয়েছিল, বদরপুর ও হাফলং স্টেশনের মধ্যে। সেদিন ট্রেন দেখতে মাহুর স্টেশনে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতারা হাজারো সংখ্যায় ভিড় জমিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটল মাইগ্রেনডিসা ও বাগেটার স্টেশনে। চার্চ মদতপুষ্ট খৃস্টান সন্ত্রাসবাদীরা ট্রেনের উপর হামলা চালায়। দু'জন নিরাপত্তাকর্মী আহত হন।

ফলে মালবাহী ট্রেন বন্ধ হওয়াতে নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম আগুন। কেরোসিন তেল ৩০/৪০ টাকা লিটার। মহকুমা শহর মাইবং থেকে রান্নার গ্যাস আনাতে খরচ পড়ছে সাত থেকে আটশো টাকা। ২১/২২ টাকা কিলো চাল মুখে দেওয়া যায় না। সরষের তেল ন্যূনতম ১০০ টাকা লিটার। মাংস তিনশো টাকা, মাছ তো পাওয়াই যায় না। ব্রয়লার চিকেন ২২০ টাকা, লোকাল ডিম চারটের দাম পঁচিশ টাকা, আলু ১৫/১৬ টাকা, পেঁয়াজ ত্রিশ টাকা, দুধ ত্রিশ টাকা লিটার। এভাবেই সাধারণ মানুষকে জীবন-যাপন করতে বাধ্য হতে হচ্ছে।

এর উপর রয়েছে জঙ্গি আতঙ্ক। নাগাল্যাণ্ডভিত্তিক খৃস্টান জঙ্গি সংগঠন এন এস সিন এবং উত্তর কাছাড়ের খৃস্টান নেতৃত্বাধীন ডি এইচ ডি (গার্লোসা) জঙ্গিদের আতঙ্কে শঙ্কিত মাইবং, লাংটিং হাতিখালি, লোয়ার হাফলং প্রভৃতি ছোট ছোট পাহাড়ি বসতি। এদিকে বারবার জঙ্গি হামলার কারণে ওইসব এলাকা থেকে শত শত মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে বলে জানা গেছে। মাহুর রেল স্টেশনের এক কর্মী নাম গোপন রাখার শর্তে জানিয়েছেন, ওখানকার সাধারণ মানুষ জঙ্গিদের ভয়ে রাত্রে ঘুমোতে পারেন না। শহরে থানা পুলিশ থাকলেও তারা আধা-সামরিক বাহিনীর উপরই বেশি করে নির্ভরশীল। এর উপর রয়েছে বিদ্যুৎ ঘাটতি। লামডিং থেকে বদরপুর — প্রায় একশ কিলোমিটার পাহাড় লাইনে বেশিরভাগ এলাকা পুরোপুরি অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। সরকার বিদ্যুতের কোনও ব্যবস্থাই করেনি। মিজোরাম ত্রিপুরা বরাক উপত্যকার (দক্ষিণ অসমের কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলা) লাইফ লাইন বলা হয় শিলচর-লামডিং মিটার গেজ ট্রেন লাইনকে। সেখানকার এই দুর্দশা মোচনে অসম সরকারের কোনও সদর্থক পদক্ষেপ এখনও চোখে পড়েনি। পাহাড় লাইনের সঙ্গে সঙ্গে লামডিং শহরে লোডশেডিং-এর কমতি নেই। ভারতে সর্বাধিক জঙ্গি উপদ্রুত রাজ্য হল জম্মু-কাশ্মীর। সেখানেও ট্রেন চলছে। অথচ অসমের ঐতিহ্যবাহী শিলচর-লামডিং পাহাড় লাইনে জঙ্গি উপদ্রবে আজ ট্রেন পরিষেবা বিঘ্নিত।

জাতিদাঙ্গায় দগ্ধ বাড়িঘর।

এই পাহাড় লাইনের সৌন্দর্য এককথায় অপরূপ। মোট ৩৭টি টানেল ভেদ করে মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসতেন দেশি-বিদেশী বহু পর্যটক। কিন্তু জঙ্গি উপদ্রবে তা বর্তমানে বন্ধ। হোজাই লামডিং, লঙ্কার হাজারো ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং ট্রেনের হকারদের মাথায় হাত।

জঙ্গি দৌরাত্ম্যের প্রথম কারণ ব্যাপক তোলা আদায়। আর দ্বিতীয় কারণ চার্চ-এর সম্প্রসারণবাদেরও এক অন্যতম পন্থা সন্ত্রাস। যদিও প্রাথমিক কারণ ছিল বৃহত্তর স্বাধীন নাগাল্যাণ্ড বা নাগালিম্ এর দাবি। উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার সিংহভাগ বাসিন্দাই ডিমাসা জনজাতি গোষ্ঠী। তাদের এক সামান্য ভগ্নাংশই খৃস্টান হয়েছে। তবে এন এস সি এন (আই এম) এবং এন এস সি এন (খাপলাং) উভয়েই উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা এবং লাগোয়া কার্বিআংলং জেলার বেশ কিছুটা এলাকা বৃহত্তর নাগাল্যান্ড-এ যুক্ত করতে চায়। কেননা ওই এলাকায় অনেক নাগা জনজাতি গ্রামও রয়েছে। এন এস সি এন জঙ্গিদের হাত ধরেই আজ থেকে প্রায় দশবছর আগে ডি এইচ ডি-র উত্থান। মাত্র ৬০০ গ্রামের উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলাও স্বাধীন হতে চায়। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বারবার জঙ্গিদের সঙ্গে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি করে ধামাচাপা দিয়েছে। সমস্যার স্থায়ী সমাধানে আগ্রহ দেখায়নি বা করেনি। ফলে সাম্প্রতিক হিংসার ঘটনায় বেশ কয়েকটি ডিমাসা ও নাগা জনজাতি অধ্যুষিত গ্রাম জ্বালানো এবং হত্যার ঘটনা ঘটেছে। সম্প্রতি উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার মাহুর থানা এলাকার ডিমাসা জনজাতি অধ্যুষিত ফাইডিং গ্রামে সন্দেহভাজন এন এস সি এন (ন্যাশন্যাল সোস্যালিস্ট কাউন্সিল অফ্ নাগাল্যান্ড) জঙ্গিরা হামলা চালায়। তারা গ্রামের ডিমাসাদের ৩৮টি বাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। তিনজন গ্রামবাসী — হোতোলাল ডিব্রাগড়ে, নিপ্রজয় ডিব্রাগড়ে ও তানজেন ডিব্রাগড়েকে হত্যা করে। অনেক গ্রামবাসীদের গুলিতে আহত করে। জেলা সদর হাফলং এর অদূরে জোরাই গ্রামেও চল্লিশটি বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে উগ্রপন্থীরা। সেখানেও দুজন নিহত হয়েছে। তারপরই আবার এহা গ্রাম আক্রান্ত হয়।

এসকল সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে দীর্ঘদিন ধরে ব্যাহত হচ্ছে শিলচর-লামডিং ব্রজগেজ রেলওয়ে এবং জাতীয় সড়ক নির্মাণের কাজ। ঠিকাদারী সংস্থার কর্মীদের বন্দুকের মুখে অপহরণ করে ব্যাপক পরিমাণে মুক্তিপণ আদায়ের ঘটনাও ঘটে চলেছে। কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকার এই জঙ্গি সমস্যার সমাধানে কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ।

অসমে ভেটিভার ঘাস দিয়ে বন্যা রোধের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। অসম সরকারের জলসম্পদ উন্নয়ণ বিভাগ এবার নদীভাঙন এবং ভূমিক্ষয় রোধে প্রাকৃতিক ব্যবস্থা নিচ্ছে বলে জানা গেছে। এই প্রাকৃতিক পদ্ধতিতেই বন্যা, ভূমিধস রোধ করা সম্ভব। এতদিন শক্তপোক্ত তারের জাল ও পাথর দিয়ে ব্যাপক পরিমাণে খরচ করে নদীর পাড় বাঁধার চেষ্টা করা হোত। তাতে ফি বছর খরচ করেও নদী ভাঙন রোধ করা যায়নি। এবার অসমে মরিগাঁও জেলার কোলং-কপিলি এবং ভুরাগাঁও এলাকাতে পাইলট প্রজেক্ট হাতে নেওয়া হয়েছে। এই রক্ষাকর্তা হচ্ছে 'ভেটিভার' নামে এক ধরনের ঘাস। ভারতের প্ল্যানিং কমিশনও দক্ষিণ ভারতে এই প্রকল্প ইতিমধ্যে অনুমোদন করেছে। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে 'ভেটিভার' কি?

ভেটিভার হল একধরনের ঘাস, যার উচ্চতা তিন ফুট মতো এবং ঝোপের আকার ধারণ করে। তবে এই ঘাসের শিকড় মাটির নীচে ৭০ মিটার গভীর পর্যন্ত চলে যায়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ভূমিক্ষয় রোধ করে। নদীর ধারে ভেটিভার ঘাস লাগালে তা ভাঙন থেকে নদীকূলকে রক্ষা করে। ছ'মাসের মধ্যেই কার্যকরী হয় এই পদ্ধতি। এমনকী জলের দূষণও প্রতিরোধ করে।

ভারত থেকে নিয়ে গিয়ে সাফল্য লাভ করেছে ফিজি, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশ। ওইসব দেশে ভেটিভার ঘাস ব্যবহার করে আটকানো গিয়েছে ভূমিক্ষয় এবং বন্যাও। ভূগর্ভস্থ জলের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রেও এই ভেটিভার ঘাস খুবই উপযোগী। অসমের একটি এন জি ও মরিগাঁও জেলাতে 'ভেটিভার' রোপন করে ভূমিক্ষয় ও বন্যারোধে কাজ শুরু করেছে। জেলাতে এই উদ্যোগ সফল হলেই সারা অসম জুড়ে যেখানে আবশ্যক সেখানেই 'ভেটিভার' লাগানো হবে বলে জানা গিয়েছে। এর আর একটি অন্য দিকও রয়েছে। ভেটিভার ঘাস লাগাতে অত্যন্ত কম খরচ হয়। প্রতি দশ কিলোমিটারের জন্য খরচ পড়বে মাত্র চার লক্ষ টাকা। এছাড়া এই ঘাস গবাদি পশুর পক্ষে ক্ষতিকারক নয়। গবাদি পশু এই ঘাস খেতে পারে। ব্রহ্মপুত্র নদীর পাশে এই ঘাস অবশ্য কার্যকর নাও হতে পারে। কেননা, ব্রহ্মপুত্র নদীতে আণ্ডারকারেন্ট (চোরাস্রোত) রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে ভূমিধস আটকাতে ভেটিভার খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। অসমে প্রতি ২৫ বছরে ৪,৪২৬ কিমি এলাকা বিলীন হয়ে যায়, যার শতকরা নববই ভাগ যায় নদীগর্ভে।

ভেটিভার ঘাস লাগানোর কাজ চলছে।

অসমে অশনি সঙ্কেত

সংবাদদাতা ।। অসমে এক অশনি সঙ্কেত বয়ে এনেছে লোকসভার ফলাফল। সদ্যসমাপ্ত লোকসভার নির্বাচনী ফলাফল-এর চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে এবং বিগত বিধানসভা (২০০৬) নির্বাচনের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে মিলিয়ে দেখলে তা খুবই স্পষ্ট ও পরিষ্কার হবে। আপাতদৃষ্টিতে রাজ্যে মোট ১৪টি লোকসভা আসনের মধ্যে সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সাতটি, বিজেপি চারটি, অগপ, এ ইউ ডি এফ এবং বোড়োল্যাণ্ড পীপুলস্ ফ্রন্ট প্রত্যেকে একটি করে আসন জিতেছে। প্রথমেই যে বিষয়টা উল্লেখ করতে হয় তা হল অসমে বিগত বিধানসভা নির্বাচনের (২০০৬) প্রাক্কালে নবগঠিত দল অসম ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এ ইউ ডি এফ)-এর সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের দুটি কেন্দ্রেই বিপুল পরিমাণে জনসমর্থন এবং একটি কেন্দ্রে (ধুবড়ি) ব্যাপক ব্যবধানে (১,৮৪,৪০৪ ভোট) জয়লাভ। বদরুদ্দিন তার অপর কেন্দ্র শিলচরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, কংগ্রেস নেতা সন্তোষমোহন দেবকে তৃতীয় স্থানে ঠেলে দিয়ে বিজেপি প্রার্থী কবীন্দ্র পুরকায়স্থের কাছে পরাজিত হয়েছেন। ব্যবধান মাত্র ২৮,৮৫০ ভোটের। অর্থাৎ বদরুদ্দিন আজমল শিলচর লোকসভা কেন্দ্রে ভোট পেয়েছেন ২,১২,০২১টি। সেক্ষেত্রে তৃতীয় স্থানাধিকারী সন্তোষমোহন দেবের প্রাপ্ত ভোট হল — ১ লক্ষ ৯৫ হাজার ২৪৩টি।

কাছাড় জেলার তিনটি মুসলিম বহুল বিধানসভা কেন্দ্রে বদরুদ্দিন আজমল উল্লেখযোগ্য লীড বজায় রেখেছেন। যার সোজা অর্থ হল মুসলমান ভোট তার ঝুলিতেই পড়েছে। এখানে মুসলমান ভোটারদের কাছে প্রথম পছন্দ কংগ্রেস নয়, নবগঠিত এ ইউ ডি এফ — যাকে এককথায় আগেকার মুসলিম লীগের এক নতুন সংস্করণ বললে অত্যুক্তি হবে না। ২০০৪-এর লোকসভা নির্বাচনে সন্তোষমোহন দেব মাত্র ২০,২০০ ভোটের ব্যবধানে জিতে মনমোহন সিং-এর মন্ত্রীসভায় ইস্পাত ও ভারী শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী হয়েছিলেন। আগের বার থেকে শিলচর (কাছাড় জেলার সদর শহর) বিধানসভা কেন্দ্রে সন্তোষমোহন দেব এবার নামমাত্র ভোট বাড়াতে পেরেছেন। লক্ষ্মীপুর বিধানসভা ক্ষেত্রে তিনি গতবার ১৫০০০ ভোটে লীড করলেও এবার মাত্র ৫৩৭টি ভোটের লীড পেয়েছেন। কবীন্দ্রবাবু শিলচর বিধানসভা ক্ষেত্রে ৫৩,৯০৩ ভোট পেলেও, সেখানে সন্তোষমোহন পেয়েছেন ৪১,২৩৬ ভোট। আর হিন্দু বহুল শহর শিলচরেও আজমলের ভোটের পরিমাণ হল ২১,৬২৬টি। সিপিএম প্রার্থীর ভাগে গিয়েছে ২,৬২৫ ভোট যা হিন্দুদেরই বলে বিশ্লেষকদের বিশ্বাস। লক্ষ্মীপুর বিধানসভা ক্ষেত্রে সন্তোষমোহন দেব ২৮,৭২৪ এবং কবীন্দ্র পুরকায়স্থ ২৮,২৩৭ ভোট পেলেও সেখানে আজমল ২৬,২৫১ ভোট পেয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। এখানে একটা কথা বলা যেতেই পারে যে, ২০১১ বিধানসভার নির্বাচনে উল্টো ফল অর্থাৎ হিন্দু ভোট বিভাজনের সুযোগে এ ইউ ডি এফ প্রার্থীর জেতার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ২০০৪-এ লক্ষ্মীপুরে শ্রীদেব ৪১,২৮৭ ভোট এবং শ্রীপুরকায়স্থ ২৬,০৪২ ভোট পেয়েছিলেন। সোনাই এবং কাটিগড়া বিধানসভা ক্ষেত্রে আজমল তার অগ্রগতির দৌড় অব্যাহত রেখেছেন। এখানে উল্লেখ্য, কাটিগড়া বিধানসভা আসনটি বিগত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-র কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন এ ইউ ডি এফ প্রার্থী। সোনাই-এ বদরুদ্দিন আজমল ৪৫,২৯৭টি, কবীন্দ্র পুরকায়স্থ ২৭, ১২২টি এবং সন্তোষমোহন দেব ২৫,২৪৪ ভোট পেয়েছেন। আর কাটিগড়ায় বিজেপি ৩৭,৭২৫টি, কংগ্রেস মাত্র ১৯,৮৩৩ এবং এ ইউ ডি এফ ৩৮,৮১১টি ভোট পেয়েছে। এমনকী যে বড়খলা কেন্দ্রে গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী নবাগতা ডাঃ রুমি নাথ কংগ্রেসী মন্ত্রী মিসবাহুল ইসলামকে হারিয়ে ইন্দ্রপতন ঘটিয়েছিলেন সেখানেও আজমল ২৯,৯৮১ ভোট পেয়ে পিছনে ফেলে দিয়েছেন কবীন্দ্রবাবুকে। কবীন্দ্রবাবুর প্রাপ্ত ভোট ২৫,১৩৪টি এবং সন্তোষমোহন দেব পেয়েছেন ২১,৪৬৫টি। তবে ধলাই বিধানসভা এলাকায় কবীন্দ্র পুরকায়স্থ সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন ৪০,৭১১ ভোট পেয়ে। ওখানে সন্তোষমোহন ২৯,২০৯ এবং আজমল সাহেব পেয়েছেন ১৮,৫৫৪টি ভোট। এখানে বলে রাখা ভালো ধলাই কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক পরিমল শুক্লবৈদ্য অত্যন্ত সক্রিয় এবং সুখে-দুঃখে সবার সঙ্গে থাকনে। শিলচর লোকসভা কেন্দ্রের ৩৩ শতাংশ মুসলমান ভোট সর্বদাই নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়ে থাকে। শিলচর কেন্দ্রে আজমল নির্বাচনী প্রচারে কখনও লাগাতার ১০০ ঘন্টা কাটাননি। গ্রামীণ মুসলমান বহুল এলাকায় আজমলের ভাষণ শ্রোতাদের সর্বথা উদ্বেলিত করেছে। আজমল এই শ্রোতাদের মধ্যে নিজেকে এক সত্যিকার লড়াকু মুসলিম নেতার ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। মাত্র তিনবছরের মধ্যেই অসমের রাজ্য রাজনীতিতে জমিয়ত উলেম-এ-হিন্দ্-এর নেতা এবং ধনকুবের বদরুদ্দিন আজমলের হাত ধরে এ ইউ ডি এফ-এর উত্থান চমকপ্রদ এবং এক সুদূরপ্রসারী ইঙ্গিতবাহী। এর সঙ্গে একমাত্র তুলনা চলে ১৯৪০-এর দশকে মুসলিম লীগের উত্থান-এর সঙ্গে। তবে '৪৬ এর ডাইরেক্ট অ্যাকশন নয়, ২০০৬-এর অসম বিধানসভা নির্বাচনে সাইলেন্ট অ্যাকশনই অসম জুড়ে এ ইউ ডি এফ-এর বিপুল জনপ্রিয়তাকে সবার সামনে তুলে ধরেছে। চল্লিশের দশকেও ভারতে এ জাতীয় 'যোগেন মণ্ডল'দের অভাব ছিল না। এখনও হয়নি। তার মূর্তিমান উদাহরণ শিলচরের প্রাক্তন সাংসদ ও কংগ্রেস নেতা কমলেন্দু ভট্টাচার্যের এ ইউ ডি এফ-এর (২০০৬ বিধানসভা) প্রার্থী হওয়া। যদিও তিনি এখন আবরও কংগ্রেসে ফিরে আসার চেষ্টা করেছেন। এ ইউ ডি এফ-এর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে অসমে গত ৬০/৭০ ধরে আগত বাংলাদেশী মুসলমান ভোটাররা। আর স্বাভাবিক কারণে অন্যান্য মুসলমানদের গরিষ্ঠ অংশ যে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে আজমলের দলকেই সমর্থন করবেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ২০০৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে কংগ্রেস আগের বারের (২০০১) তুলনায় নয় শতাংশ ভোট কম পায় এবং ১৭টি বিধানসভা আসন হারায়। ২০.৩৯ শতাংশ ভোট পেয়ে এ জি পি ২৪টি আসন দখল করে। বি পি পি এফ (বোড়ো পীপুলস্ প্রগ্রেসিভ ফ্রন্ট) ১২টি আসন জেতায় তাদের সঙ্গে নিয়ে কংগ্রেস রাজ্য মন্ত্রীসভা গঠন করে। এদিকে প্রথমবার নির্বাচনে নেমেই এ ইউ ডি এফ দশটি আসনে জয়লাভ করে। ২০০১-এর জনগণনা রিপোর্ট এবং আভাস মিলিয়ে অসমের অর্দ্ধেক জেলাই ইতিমধ্যে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গিয়েছে বলে ধরে নেওয়া ভুল হবে না। সেক্ষেত্রে বরাকভ্যালির তিনটি জেলা — কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দির হিন্দুদের কাছে নিঃসন্দেহে এক অশনি সংকেত। হিন্দু হিসাবে একতাবদ্ধ না হলে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে গভীর খাদ। সম্প্রতি (মার্চ-০৯) করিমগঞ্জ জেলার ভাঙ্গা বাজারের উঠতি ব্যবসায়ী শম্ভু দাসের অপহরণ ও হত্যা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

বদরুদ্দিন আজমল

দেওয়াল লিখন পড়তে পারেননি

(৫ পাতার পর)

পঞ্চায়েত নির্বাচনে বস্তুত বাম ঐক্যকে এড়িয়ে সিপিএম একাই লড়ে গেলো। ফল হল খারাপ। বিধানসভার উপ-নির্বাচনেও বিপুলভাবে পরাজয় হল। তবু সিপিএম-এর নেতৃত্বের কর্মীদের অভ্রংলেহি মনোভাব হ্রাস পেলো না।

লোকসভা নির্বাচনের আগে পায়ের তলার মাটি না পেয়ে তখন বিমান বসু বামঐক্য-এক-এর জন্য হামলে পড়লেন।

নির্বাচনী প্রচারে সিপিএম নেতাদের বিভিন্ন বক্তব্য মানুষকে বিরূপ হতে সাহায্য করলো। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্যামল চক্রবর্তী মমতা-কে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে বললেন, "কেউ যেন মেয়ের নাম মমতা না রাখে।" কেন্দ্রীয় কমিটির আর এক সদস্য বিনয় কোঙার বললেন — "আমাদের মহিলারা পাছা দেখাবেন!" এতে ভোট বাড়ে না — কমে। বিশেষ করে মহিলারা বিরোধী হন।

বিমানবাবু নির্বাচনী সভায় দুম করে বলেন "শতাব্দী নাচন কোঁদন" — সেই শতাব্দী বিমানবাবুদের কলা দেখিয়ে জনগণের ভোটেই নির্বাচিত হয়ে গেলেন। ছিঃ বিমানবাবু।

লোকসভার ফলাফলের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াতে বিমান বসু তৃতীয় ফ্রন্টের স্লোগান, স্থায়ী সরকার ইত্যাদি বলে নিজের দোষ-ত্রুটিকে আড়াল করার অপচেষ্টা করেন। এসব হাওয়া ত্রিপুরা রাজ্যে কেন প্রবেশ করতে পারলো না। সেখানে সিপিএম দুটি লোকসভার কেন্দ্রে জয়ী হয়েছে এবং নিচের তলায় ৬০টি বিধাসভা কেন্দ্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়েছে। বিমানবাবু-বুদ্ধ বাবু-নিরুপমবাবু লজ্জার মাথা খেয়ে একটু ভাবুন! আজকের পরাজয়ের জন্য দায়ী হলেন বুদ্ধ-বিমান-নিরুপম-বিনয় — এই গ্যাং অফ ফোর বা দুষ্ট চতুষ্টয়।

মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লার কোনও বক্তব্য শোনা হয়নি, গৌতম দেবকে পাত্তা দেওয়া হয়নি।

বর্তমান পরাজয়ের কারণগুলি হল— (১) অভ্রংলেহি মনোভাব (২) নিচের তলার কর্মীদের মস্তানি (৩) নন্দীগ্রাম (৪) সিঙ্গুর (৫) পার্টির থেকে ব্যক্তির প্রাধান্য (৬) বামফ্রন্টকে তুচ্ছ জ্ঞান করা (৭) ছোট শরিকদের পাত্তা না দেওয়া এবং (৮) মুসলিমদের অযথা তোষণ।

এই মুসলিম ভোটাররা বুদ্ধ বাবুদের কাঁচকলা খাইয়েছে। রাতের পর রাত মুসলিম ধর্মগুরু ফুরফুরা শরীফ প্রধান মুসলিমদের বুঝিয়েছেন সিপিএম মুসলিমদের শত্রু। বুদ্ধ বাবু পশ্চিমবঙ্গের বাল ঠাক্‌রে।

বুদ্ধ বাবু নির্বাচনী সভায় ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভাষণেই ব্যস্ত ছিলেন যাতে ছিল না কোনও যুক্তি। ছিল তেজ-অহঙ্কার-শ্লেষ, ছিল না দোষের ক্ষমা প্রার্থনা।

কাগজে বুদ্ধ বাবুর নতমস্তক ছবি এবং পদত্যাগের নাটক দেখা গেল। বুদ্ধ বাবু নিজে থেকে কখনই ক্ষমতা ত্যাগ করবেন না। তাঁর প্রমাণ তিনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে আবার ফিরে আসার জন্য প্রকাশ কারাত, ইয়েচুরির কাছে তদ্বির করেছিলেন।

এই কলামের এক লেখায় বলা হয়েছে — জ্যোতিবাবুকে যে কায়দায় সরানো হয়েছে সেই কায়দায় বুদ্ধ বাবুকে কি সরানো যাবে?

কলকাতা পৌরসভার নির্বাচন এগিয়ে আসছে। কলকাতার পাঁচটি ওয়ার্ড বাদে সব ওয়ার্ডেই বামফ্রন্ট ভোটে সংখ্যালঘু। কলকাতার সবকটি বিধানসভায় বামফ্রন্ট হেরেছে। উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদীয়া জেলাতে সিপিএম শেষ। এইসব জেলার নেতাদের কি সরানো হবে। সাহস নেই। কে কাকে সরায়? পার্টিতে এখন নেতাগিরি বাঁচাও কমিটি গঠিত হয়েছে। নেতারা পরস্পর পিঠ চুলকে দিচ্ছেন। কেউ কারুর বিরুদ্ধে নেই।

সুভাষ চক্রবর্তীও এই নির্বাচনের ৪৮ ঘন্টা আগে দূরদর্শনের এক বেসরকারি চ্যানেলে পার্টি সিদ্ধান্তের এবং পার্টি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। তবে সুভাষ চক্রবর্তীকে কে পার্টি থেকে হঠাবে? না হঠালে পার্টির অবলুপ্তি হবে।

আর একটি ভয়ঙ্কর কথা জানাই। পার্টির না খেতে পাওয়া কমরেডরা সিপিএম-এর বিরুদ্ধে পার্টি নেতাদের একটা শিক্ষা দেবার জন্য বিরুদ্ধে ভোট করেছেন। শোনা যায় একটা অঘোষিত মেশিনারী সূক্ষ্মভাবে পার্টি বিরোধী ভোট চালিয়েছে। এমনকী যেখানে বুথ দখল করে ভোট করা হয়েছে — সেখানেও পার্টির বিরুদ্ধেই বোতাম টেপার কাজ করেছেন পার্টির লোক বলে পরিচিত ম্যাসলমানরা। ব্যুমেরাং— সর্ষেতে ভূত।

সিপিএম-এর উঠে দাঁড়ানো সম্ভব হবে না। কারণ প্রশাসন ও পুলিশের উপর নির্ভর করে এতদিন চলেছে — প্রশাসনের একাংশ এবং পুলিশের বৃহদংশ সিপিএম-এর বিরুদ্ধে চলে যাবে। যেমন ম্যাসলম্যানরাও ধীরে ধীরে বিরোধী শিবিরে ভিড় করবে। পার্টি নেতৃত্বের অহমিকা, ব্যর্থতায় নিচের কর্মীরা মার খাবেন। পার্টিতে আর নতুন কর্মী আসার পথও বন্ধ হবে — পুরানোরা বহু সংখ্যায় বসে যাবেন। নেতারা তো নিজেদের তাঁদের পরিবারের আখের গুছিয়েছে গোষ্ঠীর লোকেদের পাইয়ে দিয়েছে।

একজন কর্মীর কথায় এক মন্ত্রী নেতার বাড়ির কুকুরটা ছাড়া সবাই ধনী হয়েছেন এবং চাকরি পেয়েছেন? বিদায় সিপিএম। তোমাদের জন্যে মানুষের ঘৃণা ও আতঙ্কই সার হল।

বুদ্ধ-বিমান-নিরুপম-বিনয়-সুভাষ-শ্যামল এরা কেউই সরতে রাজি হবেন না— কেউ সরাবেন না। কারণ পার্টির বেতনভুক্ত সারাক্ষণের কর্মী। গণসংগঠনের বেতনভুক কর্মীরা এবং পার্টির দয়াতে চাক্‌রী প্রাপ্তরা এই অপদার্থ নেতাদের রক্ষা ব্যূহের কাজ করবেন। তবে দুঃস্থ কমরেড — যাঁরা চাকরী পাননি, যাঁদের পুত্র কন্যারা বেকার— তাঁরা আরও বিরোধী হচ্ছেন। কারণ দেখছেন মন্ত্রীদের পরিবারের বিত্ত-বৈভবের এক লুঠের ব্যবস্থা।

শেষ করার আগে বিমান বসুর বিভিন্ন সভায় উক্তি— বিশেষ করে উলুবেড়িয়াতে তিনি বলেছিলেন, "বিরোধীরা দেওয়ালের লিখন পড়তে পারছে না।" আসলে বিমান বাবুরাই দেওয়ালের লিখন পড়তে চরম ব্যর্থ হয়েছিলেন।

গল্প

অ্যাপয়েন্টমেন্ট

নির্মল কর

কোচবিহারের আকাশে হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হল দৈত্যের মতো এক ঝাঁক কালো মেঘ। সূর্য চলে গেল মেঘের আড়ালে। দুপুরে শহরের বুকে নেমে এল রাতের অন্ধকার। সেই সঙ্গে দমকা হাওয়ার শাসানি আর ইলশেগুড়ির ছিটেফোঁটা। হঠাৎ আবহাওয়ার এই পরিবর্তনে হতচকিত মানুষ, দিশেহারা। খবরের কাগজে হাওয়া অফিসের রোজই খবর বেরুচ্ছে, বর্ষা নাকি দু'চার দিনের মধ্যে তড়বড়িয়ে নেমে যাবে।

কলকাতায় ইতিমধ্যেই জল থৈ থৈ অবস্থা। বহুদিন পর জল মেখে রাস্তাঘাট শীতল অজগরের মতো চকচকে হয়ে শেষে হাঁটুজলের তলায় ডুব দিয়েছে। তাতেই সব প্রায় অচল। পাকাবাড়ির কার্নিসে জবুথবু হয়ে বসে থাকা ভিজে কাকের বিরক্তিকর ডাক। বাড়ির জল-নিকাশি নল বেয়ে ঝরে-পড়া জলস্রোতের দিকে তাকিয়ে কোনও ভূগোল-বিলাসী ছাত্র হয়তো লিভিংস্টোনের মতো আবিষ্কার করে ফেলেছে নতুন এক নায়েগ্রা জলপ্রপাত। গ্রাম বাংলারও রীতিমতো বেহাল অবস্থা। দশদিক উদ্ভাসিত সবুজ আলোয় হঠাৎ নবাবের মতো প্রকৃতিতে সাজোসাজো অবস্থা। জনপদের টিনের চালে বর্ষার নিরবচ্ছিন্ন জলতরঙ্গ। দূরে দূরে নিঃসঙ্গ তালগাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে।

কোচবিহার বিমান-বন্দরের ডোমেস্টিক লাউঞ্জে বসে দুই শহরের প্রকৃতির বিষণ্ণ আবহাওয়ার কথা ভেবে খুবই হতাশ হয়ে পড়ছিলাম। অপেক্ষমান যাত্রীদের চোখে মুখে উৎকণ্ঠা, সন্ধ্যের বিমান ধরার জন্য হত্যে দিয়ে পড়ে আছেন। একটা সুরেলা কণ্ঠস্বর সেই থেকে মাইক্রোফোনে আবহাওয়ার নানা পরিস্থিতির কথা ঘোষণা করে যাচ্ছে। কিন্তু সেসব স্বস্তি দেবার মতো কোনও খবরই নয়, যেহেতু প্লেন ছাড়ার কোনও ঘোষণা নেই।

এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে আমার হঠাৎ নজরে এল এক অশান্ত মানুষ। পোশাকে চাল-চলনে ভদ্রলোক যে সামরিক বাহিনীর পদস্থ লোক তাতে সন্দেহ রইল না। এক মুহূর্তের জন্যে তাঁকে স্থির হয়ে বসতে বা দাঁড়াতে দেখলাম না। লাউঞ্জের মধ্যে অস্থিরভাবে শুধু পায়চারি করে চলেছেন। আর কব্জি ঘুরিয়ে বারবার ঘড়ি দেখছেন। পকেট থেকে রুমাল বের করে অনবরত কপালের ঘাড়ের ঘাম মুছছেন।

রাত বাড়ছে। ভিড় বাড়ছে চেকিংয়ের কাউন্টারে। যাত্রীদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা, বিশৃঙ্খলাও বাড়ছে। চেকিং পর্ব চলছে ঢিমেতালে।

একসময় যাত্রীদের আশ্বস্ত করে মাইক্রোফোনে ঘোষণা করা হল, কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। আকাশে দুর্যোগের ঘোরও প্রায় কেটে গেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কলকাতাগামী উড়ান টেক অফ্ করবে।

কিছুক্ষণ আগের গুমোট লাউঞ্জ হঠাৎ মুখর হয়ে উঠল। মুহূর্তেই রূপোলি পাখনায় আলোর ছটা ছড়িয়ে সশব্দে একটি বিদেশি বিমান আকাশে উঠে গেল এবং ছোট পাখির মতো অদৃশ্য হয়ে গেল।

সাহিত্যের পাতা

মিলিটারি ভদ্রলোক এতক্ষণে একটু শান্ত হয়েছেন মনে হল। ছোট এয়ার-ব্যাগটি কাঁধে তুলে নিলেন। দু'হাতে লাল চীনা-কাগজে মোড়া রকমারি একটি ফুলের তোড়া।

আধ ঘন্টার মধ্যে বিমান আকাশে উড়ল। মিলিটারি ভদ্রলোকের চোখেমুখে সপ্রতিভ হাসিখুশি ভাব। কিন্তু তখনও বারবার ঘড়ি দেখছেন আর অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন। নিশ্চয় কলকাতায় এমন কোনও জরুরি কাজ তাঁকে এতটা উতলা করে তুলেছে। মনের এই অবস্থায় নিজের ঘড়িকেও আর বিশ্বস্ত মনে হচ্ছে না। তাই এক ফাঁকে আমার ঘড়ি থেকে সময় মিলিয়ে নিলেন।

সিটটা কাছাকাছি পড়েছিল। আলাপও হল। ভদ্রলোকের নাম ইয়াসমিন গোমেস। জাতিতে খৃস্টান। রাশভারি লোক নন, আবার আলাপীও না। ডিটেনশনের জন্যে তাঁর মেজাজটি সেই থেকে বিগড়ে ছিল। কথাবার্তা বা আলোচনা তেমন জমল না দেখে আমিও চুপ করে গেলাম। তবে একটা বিশেষ জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতেই নাকি কলকাতায় উড়ে যেতে

হচ্ছে ইয়াসমিন গোমেসকে।

বিমান যখন দমদমের মাটি স্পর্শ করল, রাত তখন এগারো। কলকাতায় যে প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টির তান্ডব বয়ে গেছে তা স্পষ্ট বোঝা গেল। দুর্যোগের কারণে এরই মধ্যে এয়ারপোর্ট প্রায় ফাঁকা। ট্যাক্সি বা প্রাইভেট কারও তেমন চোখে পড়ল না। যে সংবাদ প্রতিষ্ঠান একটি বিশেষ সংবাদ কভারেজ করতে আমাকে কোচবিহারে পাঠিয়েছিল, তাদেরই স্টেশন ওয়াগন অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে। চেক-আউটের ফর্মালিটি মিটিয়ে বাইরে এসে গাড়িতে উঠতে যাব এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন ইয়াসমিন গোমেস। তাঁর চোখমুখে উৎকণ্ঠা আর করুণ আকুতি। অধৈর্যের মতো বললেন, মিস্টার, আপনি কি সাউথের দিকে যাচ্ছেন?'

বললাম 'হ্যাঁ।'

আমার হাত চেপে ধরে বললেন গোমেস, 'আমাকে একটু' লিফ্‌ট দিতে হবে, প্লিজ! আই অ্যাম্ সো হারি ফর মাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট।'

ড্রাইভারকে ইঙ্গিত করতেই সে দরজা খুলে দিল।

নানা জায়গায় রাস্তা প্রায় জলের তলায়। তখনও বৃষ্টি হচ্ছে। জল কেটে ছপছপ করে ছুটে চলেছে গাড়ি। ফুলের তোড়াটা সাবধানে কোলের ওপর নিয়ে বসেছেন গোমেস। মনের অস্থিরতা তখনও তাঁর থামেনি।

পরিবেশটাকে হাল্কা করতে জিজ্ঞেস করলাম, 'এতদূরে এসে ফ্লাওয়ার বুকে নিয়ে কোথায় যাবেন? জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্টটা কি মিলিটারি, না সিভিল?'

গোমেসের মুখে বিষণ্ণ হাসি। চাপা গলায় সংক্ষেপে বললেন, 'সিভিল।'

'এই ঝড় জলেও সেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে হবে?'

'মাস্ট! আই কান্ট হেল্প!' ঋজু, দৃপ্ত কণ্ঠে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করলেন ইয়াসমিন গোমেস।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। গোমেস ফের নিজেই কথা বললেন, 'জানেন মিস্টার, মাই লেডিলাভ স্টেলা ছিল দারুণ অভিমানী। আমাদের দু'জনের অ্যাফেয়ারের কথা স্টেলার ড্যাডি জানতেন। কিন্তু কিছুতেই আমার সঙ্গে মেয়ের শাদি দিবেন না। স্টেলাও অ্যাডামেন্ট, বহুৎ জিদ্দি। গোমেসের সঙ্গে শাদি না হলে শী উইল কমিট সুইসাইড। মেয়ের আবদার রাখতে বাধ্য হয়ে ভদ্রলোক আমার সঙ্গে একদিন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলেন। লেকিন আফসোস কি বাত-কী বলব স্যার, পৌঁছতে একটু দেরি হয়ে গেল। স্টেলার ড্যাডি পাঁচ মিনিটও অপেক্ষা না করে আমার নামে একটা ফিলদি কমেন্ট করে কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন। রাগে অপমানে স্টেলাও নিজের গাড়ি নিয়ে ঝড়ের মতো বেরোলো রাস্তায় — আমার সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত করবে বলে। লেকিন বেশি দূর যেতে হোল না। এমনই হেস্টি গাড়ি চালালো যে, বেরিয়েই এক হরিবল্ অ্যাকসিডেন্ট করে বসলো। সেখান থেকে সোজা হসপিট্যাল। জ্ঞান ফিরতেই স্টেলার চোখে-মুখে টনটনে অভিমান। ওর কাছে যিশুর নামে শপথ করতে হল, জীবনে আর কখনও দেরি হবে না, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেল হবে না। তারপর সুন্দর ও জয়ের হাসি হেসে নিশ্চিন্তে চোখ বুঝল স্টেলা। আমার একটা হাত ওর শক্ত মুঠোর মধ্যে। লেকিন সে চোখ আর খোলেনি স্টেলা।'

কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে ডুক্‌রে কেঁদে ফেললেন ইয়াসমিন গোমেস।

কাছেই সশব্দে একটা বাজ পড়ল। বৃষ্টি তখনও থামেনি।

গাড়ি জোড়া-গীর্জা পেরিয়ে পার্ক স্ট্রীটের জনবিরল কবরখানার কাছে আসতেই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই ড্রাইভার, রোকোরোকো!'

আমি অবাক হয়ে বলি, 'সে কি, এখানে?' 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে!'

গাড়ি ঠিক কবরখানার গেটের মুখে এসে থামল।

ইয়াসমিন গোমেস তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে এলেন! তারপর থমথমে মুখে সোজা আমার দিকে ঝুঁকে ভিজে গলায় বললেন, 'স্টেলাকে হস্পিটাল থেকে এই সেমিটারিতে আনা হয়েছিল। এরকমই একটা দিনে — সেভেন্টিন্থ্ জুন। সেই দিনটিও ছিল সাচ্ অ্যাপেন্সিভ অ্যান্ড রেইনি।....এখানেই ঘুমিয়ে আছে স্টেলা।'

ইয়াসমিন গোমেসের গলা বুজে এল। ছলছল করে উঠল চোখ দুটি। তারপর বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ফুলের তোড়া হাতে ঈশ্বরে সমাহিত কবরের মানুষগুলোকে দু'পাশে রেখে অন্ধকার কবরখানার মধ্যে হন্‌হন্ করে হেঁটে মিলিয়ে গেলেন ইয়াসমিন গোমেস।

রম্যরচনা

ভুল ভ্রা

শ্যামাপ্রসাদ দাস

আমাদের সমরবাবু। অশোক নগর শশীবালা শিশু উদ্যানের কাছের বাসিন্দা। এক সময় বেশ হাসিখুশী ছিলেন। ইদানীং কি যে হল তার। মাঝে মাঝে সব ভাবতে থাকেন। এসব নিয়ে স্ত্রীর মিষ্টি মধুর বকুনিরও অন্ত নেই। তথাপি তিনি স্বাভাবিক হচ্ছেন না। ডাক্তার-বদ্যি অনেক দেখিয়েছে পুত্র বিশ্বনাথ। প্রিয় গিন্নী মমতাও কড়া হাতে অভ্যাস পাল্টাতে চেষ্টা করেছেন; কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। কারো কারো মতে সংবাদ পত্রে অশুভ সংবাদ পড়ার কু-অভ্যাসের ফলেই তার এই মস্তিষ্ক বিকৃতি। যাই হোক, এখন সকলেই হাল ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ। যেমন খুশি চলছেন সমরবাবু।

সকালে উঠেই সমর বাবু ছোটেন সংবাদপত্রের সন্ধানে। তারপর দু'খানা পত্রিকা এনে ঘন্টা দুই বসে পত্রিকা পাঠ করেন। সাম্প্রতিককালের অশুভ সংবাদ নিয়ে শুরু হয় তার নানা রকম চিন্তা-ভাবনা। কখনও বা এসব নিয়ে তিনি এমন সব গল্প তৈরি করেন, যা বেশ হাসির খোরাক যোগায়। এইতো সেদিন তার বন্ধু নরেনবাবুকে বললেন — দাদা, সেদিন খেজুরীতে গিয়ে এমন একটা খেজুরী দেখলাম, তা আর তোমাকে না বলে পারছি না। দেখি একদল লোক লাঠি, বন্দুক কেরোসিনের টিন নিয়ে মিছিল করে যাচ্ছে। সামনে নেতার হাঁক, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো! এমন সময় দেখি এক কিশোর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কবিতা পাঠ করছে—

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
আমি যেন কোনওদিন মিছিলে না চলি।
রাখাল গরুর পাল নিয়ে যায় মাঠে,
সন্ত্রাসবাদীরা সব কাঁচা ধান কাটে।
আগুন লেগেছে ভাই খৈ ফোটে মুখে,

ভাষণ কথনে নেতা আছে মহাসুখে।

তারপর দেখি চারদিকে চলছে বাড়ি ভাঙচুর। দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। লোকের ছোটাছুটি। মহিলাদের বুকফাটা কান্না। সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

এ-কথা শুনে নরেনবাবু ভয়ে আড়ষ্ট। তিনি চোখ বড় বড় করে বললেন — দাদা, পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিলো না?

মানুষ

দেবাদিত্য চক্রবর্তী

পুরো হরিসামন্ত নগর জলে থৈ থৈ করছে। দামোদরের বাঁধ ভেঙে কাল রাত থেকেই জল ঢুকছে এখানে। আজ সকালেই প্রায় এক কোমর জল, হরিসামন্ত নগর এবং আশে-পাশের অঞ্চ লগুলি এখন বন্যায় ভেসে গেছে।

দোতলার ছাদে দাঁড়িয়ে বিপ্লব পরিস্থিতি বিচার করছিল। নীচের থেকে জিনিসপত্র যতটা সম্ভব উপরে তোলা হয়ে গেছে। কল্পনা এখন সেই সবই গোছগাছ করছে। ঝামেলা তো কম নয়, তার উপর পুচকেটাকে সামলানো। সকাল থেকেই গজগজ করছে সে।

বিপ্লব ছাদ থেকে নেমে দোতলার ঘরে এলো, আজ মাত্র একবছর হয়েছে দোতলাটা করেছে, নীচের তলায় কিছু মেরামতির কাজ ছিল।

আগে সে থাকতো পাশের কলোনীতে। যৌথ সংসার বাবা মা ভাইকে নিয়ে। কিন্তু তারপর যা হওয়ার হল, সবারই তো উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে। হাতে পয়সা এলে কে আর একসাথে থাকতে চায়। দুই ভাইই আলাদা আলাদা বাড়ি করে সেখানে উঠলো। বিপ্লবই আগে এসেছে। কল্পনার পক্ষে অতো ঝামেলা সামলানো সম্ভব হচ্ছিলো না, বড় দায়িত্ব। শিশুপুত্রকে সামলিয়ে সংসার করতেই সে হিমসিম খাচ্ছে। আজকে সে আর অফিস যাবে না। জলের অবস্থা দেখার জন্য একবার রাস্তার জলে নামবে বলে ঠিক করলো বিপ্লব। আশেপাশের একতলা বাড়ির লোকেদের কী অবস্থা দেখা দরকার। সে নাগরিক কমিটির সেক্রেটারি বলে কথা। এই সময় নীচের তলায় জলের মধ্যে কারও চলাচলের আওয়াজ পেয়ে কল্পনা সিড়ি দিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে দেখলো — এক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা জল ভেঙে সিঁড়ির দিকে আসছে।

— এই যে দ্যাখো, তোমার বাবা-মা

এসে হাজির হয়েছে। নিরাসক্ত গলায় কথাগুলো বলে কল্পনা।

— সেকি! বলে খাট থেকে ব্যস্ত - সমস্তভাবে নেমে এলো বিপ্লব, তারপর সিঁড়ির সামনে গিয়ে অবাক ভাবে বললো —

কি ব্যাপার, তোমরা আবার এখানে কেন? কেন আবার, আমাদের কলোনী তো ভেসে গিয়েছে, ঘরের ভেতর এক হাঁটু জল। থাকবো কোথায়?

তাই চলে এলাম বাবা।

বিপ্লবের কথায় ওরা দু'জন সিঁড়িতে উঠতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন।

ভাই-এর ওখানে তো গেলে পারতে। মা বললেন, ওদের অসুবিধা হবে বলল তাই তো এখানে এলাম।

- ওদের অসুবিধে হবে, আর আমার কি সুবিধে হবে?

- আরে বাবা সারাজীবন থাকবো বলে তো আসিনি,

সে নাই — বা থাকলে, আমারো তো সুবিধে অসুবিধে আছে নাকি।

বিপ্লবের কথায় স্পষ্ট বিরক্তির ঝাঁঝ। বাবা-মা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো

— আমার এখানে দুটো মাত্র ঘর। তাও জিনিস পত্রে ঠাসা। তার উপর বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে তোমাদের থাকতে দেব কোথায়?

বাবা হতাশ গলায় বললেন, তাহলে আমরা যাবো কোথায়? বিপদে পড়লে তোমরা যদি না দ্যাখো....

বিপ্লব তার কথা শেষ হবার আগেই ঝাঁঝিয়ে উঠলো। দেখছো তো কি অবস্থার মধ্যে আছি। এইই সামলে উঠতে পারছি না, তার মধ্যে এসে উদয় হয়েছ। সত্যি তোমাদের কোনও বিচার-বুদ্ধি নেই বাবা।

সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে বাবা নীচু স্বরে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছো বাবা, বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ না পেলে কি আর কেউ সন্তানের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করে। আমাদের ডিউটি যে শেষ, এখন বাণপ্রস্থে যাওয়ার সময়, এখন কী আর নতুন করে মায়ায় জড়ানো উচিত। তুমিই ঠিক।

বিপ্লব বিরক্তির সঙ্গে বললো, তার চেয়ে যাও। এখানে স্কুলবাড়িতে উদ্বাস্তুদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, সেখানে নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে। আমি না হয় মাঝে মাঝে গিয়ে দেখাশোনা করে আসবো।

বাবা বিষণ্ণ হেসে বললেন, অতো কষ্ট তোমার না করলেও চলবে বাবা। মরে গেলে পোড়াবার লোক ঠিক জুটে যাবে।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কোমর জল ঠেলে এগিয়ে যেতে থাকলেন স্কুলবাড়ির উদ্দেশ্যে। এখন আবার টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। বৃদ্ধের চোখে পড়লো — কিছু দূরে একটা উঁচু ইঁটের গাদার উপর একটি বড় কুকুর বসে আছে। আর তার পাশে শুয়ে মিউমিউ করছে একটি বাচ্চা বেড়াল। কুকুরটি মাঝে মাঝে জিভ দিয়ে চেটে দিচ্ছে তাকে।

বৃদ্ধের চোখটা হঠাৎ ঝাপসা হয়ে এলো, মুখে ফুটে উঠলো এক বিচিত্র হাসির রেখা। নাঃ এরা জানোয়ারই রয়ে গেল। এখনও মানুষ হলো না।

ন ভ্রান্তি

শ্যামাপ্রসাদ দাস

এবার হেসে ফেললেন সমরবাবু। কী যে বলেন, দাদা, দেশে এখন মন্ত্রীরা সব মার্কসবাদী, পুলিশরা গান্ধীবাদী, সন্ত্রাসবাদীরা সব জিন্নাবাদী আর জনসাধারণ গণতন্ত্রবাদী। কেউ কারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করার নিয়ম নেই। এর নাম স্থিতাবস্থাবাদ। অতএব দেখুন। শুনুন। এগিয়ে চলুন। এটাই নিয়ম।

এসব কথা শুনে নরেনবাবু আস্তে করে বললেন — চুপ করো, আর নয়। এ সবই নব্য সংস্কৃতি। এক কথায় যাকে বলে প্রগতির অধোগতি। শুধু কি নন্দীগ্রাম খেজুরী। গোর্খাল্যান্ডের লণ্ডভণ্ড। লালগড়ের লাল সূর্যের উষ্ণতা, সবই "তুমি সরো আমি বসি"। সরে গেলেই আবার শশী মুখে হাসি। নন্দীগ্রাম, খেজুরী, লালগড়, গোর্খাল্যান্ড, সব আন্দোলন হয়ে যাবে বাসি। আর নয়। এবার চুপ করে ঘরে চলুন। গল্প শেষ।

আর একদিনের কথা। সমরবাবু আর নরেন বাবু একটা দোকানে বসে চা বিস্কুট খাচ্ছিলেন। এমন সময় এক মস্তান এসে, বললো — এই উঠুন তো। কোথাও একটু শান্তিতে বসার উপায় নেই। যত সব বুড়ো-হাবড়ার দল।

নরেনবাবু প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন। সমরবাবু তার হাত টিপে সাবধান করে বললেন — চলুন, উঠুন, রৌদ্রে গিয়ে দাঁড়াই।

কিছুক্ষণ পরে তারা আবার এগিয়ে চললেন। যেতে যেতে দেখেন একদল লোক চোলাই মদের ঠেক ভাঙছে। তা দেখে সমরবাবু বললেন — চুল্লু সংস্কৃতি বিরোধী লোকগুলোর কান্ড-কারখানা দেখেছেন? আচ্ছা বলুন তো, রাশিয়ান মদ ভদকা ভালো, না বাংলা মদ চুল্লু ভাল?

নরেনবাবু একটু মাথা চুলকিয়ে বললেন — রাশিয়ান ভদকা হল গিয়ে কতকটা দিল্লীর লাড্ডুর মতোন। যে খায় সে পস্তায়, যে খায় না সেও পস্তায়। কিন্তু আমাদের বাংলার চুল্লু একদম উল্লু না বানিয়ে ছাড়ে না, কিন্তু লোকগুলো এমন একটা প্রাচীন সংস্কৃতি নষ্ট করে দিচ্ছে, তা কি ঠিক! এর সুরক্ষার জন্য সরকারকে এগিয়ে আসতেই হবে।

(এরপর ১২ পাতায়)

বুদ্ধদেব বসু ঃ শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি

নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তর সময়ে পৃথিবীব্যাপ্ত সামাজিক অবক্ষয়, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মূল্যবোধ বিচ্যুতি, মানবিক সম্ভাবনায় অবিশ্বাস এবং পোড়ো জমিতে ফাঁপা মানুষের বিপন্ন অস্তিত্বের পরিবেশে বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-১৯৭৪) দীপ্ত আবির্ভাব। বুদ্ধদেব বসুর জীবনবোধ ও শিল্পীসত্তার মৌল পরিচয় তাঁর প্রবাদ প্রতিম আমিত্ব, আত্মতা এবং নিঃসঙ্গতার মধ্যে নিহিত। আত্মতা এবং আমিত্বই তাঁর সাহিত্যকর্মের মুখ্য উপজীব্য। বিচ্ছিন্নতা ও একাকিত্বের যন্ত্রণায় জীবনভর বেদনার্ত ছিলেন তিনি। আত্মজৈবনিক এই বেদনার প্রতিভাস তাঁর সৃষ্টিশীল রচনাকর্মে যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় তাঁর পত্রাবলীতে। বুদ্ধদেব বসু সনাতন ভারতীয় মূল্যবোধে বিশ্বাস হারিয়েছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি রাখতে পারেননি আস্থা — এমন কথা বলা হলেও তার পুরাণাশ্রয়ী নাটক রচনায় সনাতন ভারতীয় মূল্যবোধই জয়ী হয়েছে বারবার। তিনি প্রধানত ব্যবহার করেছেন মহাভারতীয় পুরাণ। তিনি বিশ্বাস করতেন সদর্থক সংস্কৃতিই হচ্ছে মানব মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায়। সংস্কৃতির স্পর্শে মানুষ পবিত্র

সাহিত্যের পাতা

হয়। সংস্কৃতি মানুষকে মানব প্রেমিক করে — এটাই বুদ্ধ দেবের পরম বিশ্বাস, ভারতীয় উপনিষদের ভাবনা তো একই পথের পথিক কিন্তু বুদ্ধ দেব এত স্পষ্ট করে উপনিষদের কথা বলেননি কারণ তাঁর পক্ষে সেদিন তা বলা সম্ভবও ছিল না। বুদ্ধ দেব বসু ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক সংঘের সদস্য ছিলেন। ঢাকায় ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ ফ্যাসিবাদ বিরোধী মিছিল করতে গিয়ে সোমেন চন্দ (১৯২০-১৯৪২) নিহত হলে বুদ্ধ দেব বসু সোমেন চন্দের অসমাপ্ত কাজে পূর্ণমাত্রায় ব্রতী হন। যদিও রাজনীতিকে কখনই তিনি সাহিত্যের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেননি। মহাভারতীয় পুরাণ নিয়ে তাঁর রচনা। তপস্বী ও তরঙ্গিনী (১৯৬৬) কালসন্ধ্যা (১৯৬৯) প্রথম পার্থ (১৯৭৮) প্রভৃতিতে ভারতীয় পরম্পরা ও মূল্যবোধকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি।

বুদ্ধ দেব বসু তাঁর কাব্যনাট্যে মহাভারতীয় পুরাণের পুনর্জন্ম ঘটিয়েছেন। সময়কাল ও শাশ্বতকালের মধ্যে মহাভারতীয় কাহিনীর সংযোগসূত্র রচনার জন্য বুদ্ধ দেব বসু কালসন্ধ্যার কাহিনীকে নতুন করে সাজিয়ে

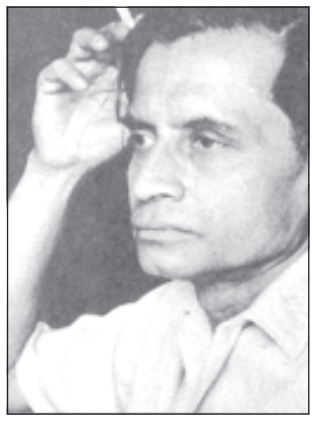

নিলেও মূলকে কখনই অতিক্রম করেননি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আঠারো দিনে যে রক্তপাত হয়েছিল, এর ছত্রিশ বছর পর কৃষ্ণ যাদববংশের শাখা, মূল এবং কাণ্ড — সমস্তই নিঃশেষে ধ্বংস করেছেন মাত্র এক মুহূর্তে। গান্ধারীর অভিশাপ এভাবেই সত্যে পরিণত হয়েছে। সুভদ্রা ও সত্যভামার বুকফাটা কান্নার উত্তরে কৃষ্ণ অমোঘ বাক্য উচ্চারণ করেছেন। কাল কিছু ক্ষমা করে না — তার কাজ বর্তমানকে অতীতের গর্ভে নিক্ষেপ করে নিঃশেষে সবকিছু মুছে ফেলা। কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের বিশ্বরূপের মধ্যে অর্জুনও তাই প্রত্যক্ষ করেছেন। 'কালসন্ধ্যা' কাব্যনাট্যে বুদ্ধ দেবের এই বক্তব্য সুপরিস্ফুটভাবে প্রকাশিত হয়েছে —

'কাল সেই গর্ভ, বীজ, ধাত্রী ও শ্মশান,
যা ঘটায়, নিরন্তর আবর্তনে,
জন্ম বৃদ্ধি অবক্ষয়, অবলুপ্তি
আনে কীর্তি এবং কীর্তির ধ্বংস,
আনে, যাকে লোকে ভাবে যুগান্তর,
কিন্তু যা নিতান্ত পুনরাবৃত্তি, শুধু
বধ্য-ঘাতকের স্থান বিনিময়।'

আসলে কালগর্ভেই এক একটি সভ্যতার জন্ম হয় — ঘটে উত্থান ও বিকাশ এবং পরে

(এরপর ১২ পাতায়)

চীনের দালাল

আবার অরুণাচল প্রদেশকে নিজেরই ভূখন্ড বলে দাবি করেছে চীন। দীর্ঘদিন ধরেই অবশ্য চীন এ দাবি জানিয়ে আসছে। যদিও অরুণাচল প্রদেশ ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম ভারতেরই একটি রাজ্য। সে রাজ্যে নির্বাচিত একটি প্রাদেশিক সরকার আছে, শান্তিপ্রিয় রাজ্যবাসী ভারতের প্রতি অত্যন্ত অনুগত, ভারতীয় আইন-কানুন ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং তাঁরা নিজেদের ভারতীয় বলে গর্ববোধ করেন। অথচ চীন গায়ের জোরে ও অনৈতিকভাবে এ রাজ্যটিকে গ্রাস করতে চাইছে। ইতিপূর্বে বহুবার চীনা সৈন্য সীমান্ত লঙ্ঘন করে রাজ্যের সীমান্তবর্তী বহু এলাকা দখল করে নিয়েছে। এখনও সীমান্ত লঙ্ঘন করে চলেছে। ফলে এ রাজ্যের আয়তন ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছে। ৬২- সালে চীন ভারত আক্রমণ করে কয়েক হাজার বর্গকিলোমিটার নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করেছে।

কয়েক বছর ধরে চীন এ রাজ্যের উন্নয়ণে বাধা দিচ্ছে। রাজ্যের উন্নয়ণে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ কার্যকর করতে নিষেধও করছে। এ ব্যাপারে সে আন্তর্জাতিকভাবেও ভারতের বিরোধিতায় নেমেছে। এরাজ্যের উন্নয়ণে ভারত যাতে কোনও আন্তর্জাতিক অর্থ প্রদানকারী সংস্থার কাছ থেকে অর্থ সাহায্য না পায় তার জন্য সে সদা সচেষ্ট রয়েছে। তাই একে চীনের সম্প্রসারণবাদ ও ভারত বিরোধিতা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে? চীন নিজেকে কমিউনিস্ট বললেও আসলে সে বড় সাম্রাজ্যবাদী।

তবে চীনের এই আচরণকে এদেশের দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলগুলি ভারতের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ বলে নিন্দা করলেও সিপিএম আজ পর্যন্ত এঘটনার নিন্দা তো দূরে থাক, প্রতিবাদ পর্যন্ত করেনি। বরং তারা এ ব্যাপারে নির্বাক ও অন্ধ 'ধৃতরাষ্ট্র' সেজে থাকাই শ্রেয় মনে করছে। '৬২ সালে চীনের ভারত আক্রমণকে তারা শুধু মেনেই নেয়নি, উল্টে বলেছে— ভারতই চীনকে আক্রমণ করেছে। আর এই মন্তব্যের জন্য তাদের বহু লাঞ্ছনা, সমালোচনা ও বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়েছে। শুনতে হয়েছে দেশদ্রোহিতার কথা। আবার এই মার্কসবাদীরাই দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টিকে করেছিলেন সমর্থন। আর সমর্থন করেই তাঁরা ক্ষান্ত থাকনেনি, কমিউনিস্ট মুখপত্রে পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্র প্রকাশ করে তাতে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, দিনাজপুর ও ত্রিপুরাকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাছাড়া আজ যে তাঁরা 'গোর্খাল্যান্ড' রাজ্যের বিরোধিতা করছেন সেটাও তাঁদের ভন্ডামি। কারণ তাঁরাই একদা (১৯৪২) প্রত্যেক ভাষাগোষ্ঠীর জন্যই পৃথক রাষ্ট্রের দাবি জানিয়েছিলেন। গোর্খাদের জন্য একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রেরও দাবি তাঁদের ছিল। দার্জিলিং জেলাকে নিয়ে 'গোর্খাস্থান'-এর প্রস্তাব তাঁরাই রেখেছিলেন এবং 'গোর্খাস্থান' নামটা তাঁদেরই দেওয়া।

কাজেই এটা আজ প্রমাণিত সত্য যে সি পি এম হচ্ছে চীন ও পাকিস্তানের মস্ত বড় দালাল, নির্ভেজাল বেইমান ও দেশদ্রোহী। তারা বেজিংয়ে বৃষ্টি পড়লে কলকাতায় ছাতা খোলার পার্টি। ভাবতে অবাক লাগে, এহেন দেশদ্রোহীরা জেলের বাইরে থেকে রাজনীতি করছেন, ক্ষমতাভোগ করছেন। ভাবতে আরও অবাক লাগে, চীন যখন শুধু অরুণাচল প্রদেশই নয়, দার্জিলিং পর্যন্ত নিজের ভূখন্ড বলে দাবি করে তখন তাঁরা নিশ্চুপ থাকেন, কিন্তু গোর্খারা যখন পৃথক গোর্খা রাজ্য দাবি করেন তখন তাঁরা 'বাংলা ভাগ হতে দেব না' বলে চিল চিৎকার শুরু করেন। এটা কি-দ্বিচারিতা নয়? তবে রাজনৈতিক মহলের ধারণা, ভারতে চীনের দালালরা আছে বলেই চীন ভারতীয় ভূখন্ডকে নিজের বলে দাবি করতে সাহস পাচ্ছে।

ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

বরুণ গান্ধী

"বরুণ গান্ধীর বিপক্ষে কেন?" প্রবন্ধটির (২০.৪.২০০৯) লেখক শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে অনেক ধন্যবাদ তাঁর দৃপ্ত রচনা শৈলী জন্য। বরুণ গান্ধীর মধ্যে যেন 'হিন্দু হৃদয় সম্রাট' নরেন্দ্র মোদীর ছায়া দেখা যাচ্ছে। মমতাজবানু কে— তা একটু বিলম্বে বুঝেছি, তাঁর নামাজ আদায় সার্থক, জাতীয় পিতার 'মুসলিম প্রেম রোগ' তার সন্তানাদির প্রতি ছড়াবে — এটাই তো স্বাভাবিক।

মুসলিমদের সাহায্যকারী জয়চন্দ্রকে মুসলিমরাই হত্যা করে এটা ঠিক। কিন্তু এ প্রসঙ্গে হোসেন শাহের মন্ত্রী রূপ, সনাতনের উদাহরণ টানা ঠিক নয়, কারণ তাঁরা দুজনেই স্বেচ্ছায় মন্ত্রীত্ব ছেড়ে গৌরাঙ্গদেবের শরণ নেন এবং বৈষ্ণবদের মধ্যে খ্যাতিমান হয়ে ছয় গোস্বামীর মধ্যে স্থান পান।

দীপঙ্কর হোমচৌধুরী, কল্যাণী, নদীয়া।

ধর্মান্তরকরণ ও অনুপ্রবেশ

ভারতবর্ষে ধর্মান্তরকরণ দীর্ঘদিন থেকে চলছে। এখন তার পরিণাম ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ৭১২ খৃঃ মুসলিম আক্রমণকারী মহম্মদ বিন কাশিম জেহাদি রূপ ধারণ করে ভারত আক্রমণ করে একহাতে কোরাণ ও অন্য হাতে তরোয়াল নিয়ে হিন্দুদের উপর অত্যাচার শুরু করেন। আর বলতে লাগলেন ইসলাম কবুল কর নতুবা প্রাণ দিতে প্রস্তুত হও! তখন অনেক হিন্দু প্রাণ বাঁচাতে মুসলমান হলেন। খৃস্টধর্মী ফ্রান্সিস জিবিওয়র ১৫৪৮ খৃঃ প্রথম গোয়াতে আসেন, এবং ছল চাতুরী ও অত্যাচারের মাধ্যমে হিন্দু যুবক-যুবতীদের ধর্মান্তরিত করেন। সেই ব্যবস্থাই আজও সেবার নামে দরিদ্র বনবাসী এলাকাতে জোর কদমে চলছে। মুসলমানদের দ্বারা ভারত ভাগ হয়েছে — পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান নামে দুই রাষ্ট্র। পূর্ব-পাকিস্তান মানে বর্তমান বাংলাদেশ। আজও সেখানে এই ধর্মান্তরকরণ চলছে। ভারত থেকে প্রতিবছর হিন্দু মেয়েদের কৌশলে মুসলমান ছেলেদের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে ধর্মান্তরকরণ করা হচ্ছে। এবং বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে দেশের ভৌগোলিক পরিবর্তন করে স্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চলছে। সরকারি হিসাবে প্রায় তিনকোটি অবৈধ বাংলাদেশী ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে তাদের জাল বিছিয়ে আছে এবং আই এস আই-এর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে নাশকতার জন্য সাহায্য করে যাচ্ছে। তাই প্রত্যেক ভারতবাসী হিন্দু ভাইদের প্রতি আবেদন যে, দেশমাতাকে এই ঘৃণ্য চক্রান্তকারীর হাত থেকে রক্ষা করতে আপনারা সকলে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। আর ব্যক্তি স্বার্থে জেগে ঘুমাবেন না।

শ্যামলকান্তি নাথ, উত্তর কাছাড়, অসম।

মুসলমান ভোট ও পেট্রোডলারের অপার মহিমা

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যাঞ্জ

পৃথিবীর যে কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হয়ে থাকে রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের স্বার্থরক্ষা করেই। ব্যতিক্রমী রাষ্ট্র ভারত। এদেশের রাষ্ট্রনায়কবৃন্দ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক তথা হিন্দুদের জন্য ভাবিত নয়। তাদের যত চিন্তা-ভাবনা দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য, বলা ভাল মুসলমানদের জন্য। এদেশে মুসলমানরা নাকি দরিদ্র, অনগ্রসর, অবহেলিত, শিক্ষার আলোক বর্জিত এবং আরও অনেক কিছু। তাই তাদের দুঃখ, দুর্দশা মোচনে সরকার সদাই তৎপর। তাদের অসুবিধা দূর করতে সংবিধান সংশোধন করা হয়। মুসলিম পার্সোনাল 'ল চালু করা হয়, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা অব্যাহত থাকে, অভিন্ন দেওয়ানী বিধি কার্যকরী করা হয় না, সাচার কমিটির সুপারিশগুলি কার্যকরী করার জন্য তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেওয়া হয়, মাদ্রাসাগুলির উন্নতির জন্য কোটি কোটি টাকা অনুদান দেওয়া হয়, মুসলিম সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ণের জন্য প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এত করেও সংখ্যালঘুদের সন্তুষ্ট করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ তাদের মন পড়ে আছে আরবের দিকে। তারা চাইছে ভারতকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে, ভারতে শরিয়তি আইন চালু করতে, সম্প্রতি যেমনটা হয়েছে পাকিস্তানের সোয়াত উপত্যকায়। কেউ কিন্তু প্রশ্ন করে না মুসলমানদের এই অনগ্রসরতা দারিদ্র্য অশিক্ষা কুসংস্কার বা ধর্মান্ধতার কারণ কি?

মুসলিম সমাজে জ্ঞানী গুণী বা পন্ডিত ব্যক্তির অভাব নেই। বড় শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, শিল্পী, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক, সঙ্গীতজ্ঞ প্রভৃতি জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা মুসলিম সমাজকে অলঙ্কৃত করলেও, নিম্নবিত্ত মুসলিম সমাজ পরিচালিত হয় কিছু অর্ধশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্মান্ধ, মৌলানা-মৌলবীদের দ্বারা। তাই তাদেরই নির্দেশে মুসলিম সমাজ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা পরিহার করে ছোটদের পাঠায় মাদ্রাসা, মক্তবের শিক্ষায় শিক্ষিত হতে। মাদ্রাসা, মক্তবে কি শেখানো হয়? কিছু আরবী ফার্সী ভাষা আর পবিত্র কুরানের কিছু আয়াৎ। এতে করে আর যাই হোক চাকরির প্রতিযোগিতায় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত প্রতিযোগীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সফল হওয়া যায় না। আরও আছে। মুসলিম সমাজে একসাথে চারটি বিবাহ ইসলাম ধর্মসম্মত। সুতরাং নিম্নবিত্ত মুসলিম পরিবারে একই ব্যক্তির ৩/৪টি বিবি। আর ৮/১০টি সন্তান কোনও অস্বাভাবিক কিছু নয়। ফলে দারিদ্র্য এদের নিত্যসঙ্গী। গ্রাসাচ্ছাদনই এদের কাছে প্রধান সমস্যা। তাই লেখাপড়ার দিকে ছোটরা না ঝুঁকে রোজগারের চেষ্টা করে। ফল বিক্রেতার ছেলে ছোট থেকেই বাবার ফল বিক্রির ব্যবসায় নেমে পড়ে। মাংস বিক্রেতার ছেলে ছাগল জবাই করতে শেখে, দর্জির ছেলে দর্জির কাজ শেখে। ধুনুরির ছেলে ধুনুরির কাজ শুরু করে। এছাড়াও আছে রাজমিস্ত্রীর কাজ, স্কুটার, মোটর সাইকেল মেরামতির কাজ, টায়ার-টিউব ভল্‌কানাইজিং-এর কাজ প্রভৃতি। এ সমস্ত কাজ মুসলমানদের একরকম একচেটিয়া বলা যেতে পারে। ফলে হিন্দু মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ বা স্নাতক তরুণ-তরুণীরা যখন একটা চাকরির জন্য ছোটাছুটি করে জুতোর সুখতলা ক্ষইয়ে ফেলছে, তখন মুসলমান যুবকরা প্রায় কেউই বেকার থাকে না। অথচ প্রচার করা হয় সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র ২ শতাংশ বা তারও কম। সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক নেতারা হই হই করে ওঠেন। প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী নেতারা প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেন। আর প্রশাসনিক ক্ষমতার অভিলাষী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে ঘোষণা করেন চাকরিতে মুসলমানদের জন্য ৩০ শতাংশ সংরক্ষণ করা হবে। মাদ্রাসা, মক্তবের জন্য অনুদান, হজযাত্রীদের জন্য ভর্তুকি, মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট প্রভৃতি উচ্চশিক্ষার সমস্ত খরচ সরকারের। মুসলমানদের জন্য এই সমস্ত রাজনীতিকদের প্রাণ "বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা।" অথচ খোঁজ নিলে দেখা যাবে এদের অনেকেই এবং তাদের আত্মীয় - স্বজন পূর্ব-পাকিস্তানে মুসলমানদের অত্যাচারে অত্যাচারিত হয়ে নির্যাতিত হয়ে তাদের সাত পুরুষের ভিটে-মাটি হারিয়ে পালিয়ে এসে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছেন। তারপর পায়ের তলায় একটু জমি পেতেই মুসলমানদের নৃশংস অত্যাচার সকল বিস্মৃত হয়েছেন। এখন মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশায় এদের প্রাণ কেঁদে উঠেছে। তাই মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে এরা জান লড়িয়ে দিচ্ছেন। রিজওয়ানুর রহমানের মৃত্যুর শোক এরা এখনও ভুলতে পারেননি।

জনমত

রাজনীতিক আর বুদ্ধি জীবীরা এখনও রিজওয়ানুরের স্মৃতিতে শোক মিছিল করেন, রিজ-এর মা কৈসর জাহানকে সান্ত্বনা জানাতে তিলজলার বস্তিতে এরা ভিড় করেন। তবে শৈলেন্দ্র প্রসাদকে জবাই করার জন্য বা অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জীবন্ত দগ্ধ করার প্রচেষ্টার জন্য এদের কোনও মাথা-ব্যথা নেই। মুসলিম ভোট আর আরবি নোটের কী অপার মহিমা!

অথচ প্রায় প্রতিটি জাতীয়তাবাদী কর্মসূচী জাতীয়তাবিরোধী মুসলমানদের প্রবল বাধার সম্মুখীন হয় এবং পরিশেষে পরিত্যক্ত হয়। জাতীয়তা বিরোধী মুসলমানদের বিরোধিতার কারণে লোকসভার অধিবেশনে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতটি সম্পূর্ণরূপে গাওয়া হয় না। এতে নাকি পৌত্তিলিকতার গন্ধ আছে। "জনগণমন...." জাতীয় সঙ্গীতটিও নাকি মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত করে, তাই এটিরও অঙ্গচ্ছেদ করা হল। বাধা এল কোথা থেকে? মুসলিম লীগের মহামান্য সাংসদ সুলেমান সঈত, জনতা দলের প্রাক্তন সাংসদ সৈয়দ শাহাবুদ্দীন, মৌলানা ওবেদুল্লা খান, আজমিসহ আরও কিছু ইসলামের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ মহান ব্যক্তি। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতটির শতবর্ষ পূর্তি' উপলক্ষে (৭ সেপ্টেম্বর, ০৬) ওই দিন সঙ্গীতটি প্রতিটি বিদ্যালয়ে গাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ণ মন্ত্রক থেকে এক নির্দেশিকা প্রেরিত হয়। কিন্তু এতেও আপত্তি জানায় দেশ বিরোধী মুসলমানরা। দিল্লীর জামা মসজিদের ইমাম সৈয়দ আহমেদ বুখারী জানায় বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতটি মুসলিম ধর্ম বিশ্বাসের বিরোধী। সুতরাং নির্দেশ প্রত্যাহৃত হল। সরস্বতী বন্দনা নিয়েও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল। কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ১৯৯৮ সালে বিদ্যালয়গুলিতে সরস্বতী স্তোত্র চালু করতে সচেষ্ট হয়েছিল। কিন্তু চারদিকে এক বিরাট সোরগোল সৃষ্টি হয়েছিল। চতুর্দিকে হায় হায় গেল গেল রব উঠেছিল। এটা নাকি ভারতের ধর্ম-নিরপেক্ষতার পরিপন্থী। অতএব, প্রস্তাবটি বাতিল হল। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম গর্ব ছৌনৃত্য। কিন্তু জাতীয়তা বিরোধী মুসলমানদের সন্তুষ্ট করতে ধর্ম নিরপেক্ষ বামফ্রন্ট সরকার ছৌ নৃত্য থেকে গণেশ বন্দনা বাদ দিয়ে দিয়েছে। এত সব ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও জাতীয়তা বিরোধী মুসলমানদের সন্তুষ্ট করতে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি এবং বুদ্ধি জীবীদের প্রচেষ্টার কোনও খামতি নেই। এই রাজনৈতিক দলগুলির কাছে বিজেপি সাম্প্রদায়িক দল হলেও, মুসলিমলীগ, অসম ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট, সিমি, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন প্রভৃতি মুসলিম সংগঠনগুলি প্রকৃত ধর্ম নিরপেক্ষ। তাই এদের সঙ্গে জোট করে রাজনৈতিক তথা প্রশাসনিক ক্ষমতা দখল করতে এরা বিবেকের দংশন অনুভব করে না। মনে হয় ওইসব রাজনীতিক আর বুদ্ধি জীবীগণ মুসলিম ভোট, আর আরবি নোটের কাছে নিজেদের বিবেক বন্ধক রেখেছে। নির্লজ্জ স্তাবকতা আর কাকে বলে? আরও একটা কারণ থাকতে পারে। এই সমস্ত রাজনীতিক আর বুদ্ধি জীবীরা নামে, পদবিতে, শিক্ষায়, আচার আচরণে পোষাকে হিন্দু হলেও সম্ভবত এদের ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে মুসলমানের শোণিত। তাই মুসলমানদের, প্রতি এদের এত অনুরাগ। মনে হয় নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এরা নিজেদের স্ত্রী কন্যা ভগিনীদেরও মুসলমানদের হাতে তুলে দিতে দ্বিধা করবে না। নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধি ই এদের কাছে প্রধান। দেশমাতৃকা নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ এদের নেই।

পরম্পরা

সুরধনী তব নাম আজও ভাসিছে ভুবনে

সোমনাথ নন্দী

অভিনব বিসবল্লী পাদপদ্মস্য বিষ্ণো মর্দন মথন মৌলের্মালতী পুষ্পমালা।
জয়তি জয়পতাকা কাপ্যসৌ মোক্ষলক্ষ্ম্যা ঃ
ক্ষপিত কালিক লঙ্কা জাহ্নবী।

আহা কী অপরূপ অভিব্যক্তি। কী অনবদ্য ভাবলহরী মহর্ষি বাল্মিকীর হৃদয় নিসৃত গঙ্গামহিমা প্রকাশে। অপূর্ব শব্দচয়ন প্রতিটি ছন্দে। অপূর্ব ভাব ব্যঞ্জনা। এ কী এক প্রাণদায়িনী নদীর প্রতি প্রশস্তি। না তা সার্বিক দেবী প্রতিমা রূপে মহাকবির মানস নেত্রে উদিতা। কী বলেছেন তিনি গঙ্গ াষ্টকের উক্ত পংক্তিতে —

দেবী তুমি বিষ্ণুচরণ পদ্মের অভিনব মৃণাল। মহাদেবের মস্তকের মালতী মালা। মোক্ষলক্ষ্মীর বিজয়কেতন স্বরূপিণী কে ইনি? কালিকলুষহারিণী জাহ্নবী পবিত্র করুন আমাদের।

বেদ পরবর্তী যুগে অর্থাৎ পুরাণ কালে নদী গঙ্গাকে নিয়ে এমন মর্মস্পর্শী প্রশস্তি সম্ভবত প্রথম। যা বিম্বিত মহর্ষির গঙ্গ াষ্টকে। রামায়ণে গঙ্গাবতরণের যে বর্ণনা দেখা যায়, পন্ডিতদের মতে সেটাই সর্বপ্রথম বিশদ বর্ণিত কাহিনী। সেখানে গঙ্গার অভিধা সুরধনী অর্থাৎ স্বর্গের নদী। মহাভারতে অনুশাসন পর্বে গঙ্গাপুত্র পিতামহ ভীষ্ম যে গঙ্গা মাহাত্ম্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে শুনিয়েছিলেন যা বর্ণনার নিরীখে, ভাষামাধুর্যে অতুলনীয়। সেখানে বলা হয়েছে — মানুষ গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাপূজায় যে উত্তম গতি লাভ করে, তপস্যা ব্রহ্মচর্য যজ্ঞ দান ইত্যাদিতে তা সম্ভব নয়। আগুনে তুলারাশি যে ভাবে ত্বরিতে ভস্মাবস্থা লাভ করে, গঙ্গাস্নানে সমস্ত পাপ তেমনিভাবে নষ্ট হয়ে যায়।

গঙ্গাবারির এমনই পাবনী শক্তি। সমস্ত জগতের পাপরাশি আপন অঙ্গে গ্রহণের জন্যই মা গঙ্গা আবির্ভূতা এই দিব্যলোকে।

বাস্তবে অনুশাসন পর্বকে উপলক্ষ করে মহর্ষি বেদব্যাসও গঙ্গামাহাত্ম্যে পিছিয়ে থাকেননি। তিনি আরও বলেছেন —

ভবন্তি নির্বিষাঃ সর্পা যথা তার্ক্ষস্য দর্শনাৎ।

গঙ্গায়া দর্শনাৎ তদ্বৎ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।

বিষ্ণুবাহন গরুড়কে দেখে সাপ যেমন নির্বিষ হয়ে যায় গঙ্গা দর্শনে হয় তেমনি সর্বপাপ মোচন। সহজ সাধ্য হয় ইন্দ্রিয় সংযম। শুরু হয় জীবনের নব রূপান্তর পবিত্রতার আধারে।

গঙ্গামহিমা পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতে যেভাবে বিধৃত, বৈদিক সাহিত্যে তার আভাস সামান্য। সেখানে নদী সরস্বতীকে বলা হয়েছে নদীত্তমা। গঙ্গ ার উল্লেখ পাওয়া যায় মাত্র ঋক্‌বেদের ১০ম মন্ডলে ৭৫-তম সূক্তে। প্রখ্যাত পন্ডিত সুকুমার সেন তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন — "এই শ্লোকটিতে উল্লেখ নামমাত্র। এখানে নদীগুলির নাম করা হয়েছে গঙ্গা-যমুনা(অর্থ — উভয়ে যমজ ভগিনী) শতদ্রু, সরস্বতী, পরুষ্ণি, অসিকন্যা (অসিক্লী), বিতস্তা, সুষমা ইত্যাদির।" আসলে এই সূক্তে গঙ্গা সামান্যভাবে ব্যক্ত হলেও গঙ্গার মূল্যায়ন তেমনভাবে হয়নি, যতটা হয়েছে সরস্বতীর। ঋক্‌বেদে উক্ত সূক্তে বাকি যে নদীগুলির কথা বলা হয়েছে তা আজও বহমান। যেমন শুতুদ্র (শতদ্রু বা সালতেজ) পরুষ্ণি (ইরাবতী বা রাভি) অসিক্নি (চন্দ্রভাগা), বিতস্তা (ঝিলাম) আর্জিকিয়া (বিপাশা বা বিয়াস), সুষোমা (সিন্ধু) ইত্যাদি।

গঙ্গার মহিমা ভারতীয় আর্যদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়ে ওঠে সরস্বতীর স্রোত হারিয়ে যাওয়ার পর। গঙ্গাতীরেই তাঁরা রচনা করেন নিজেদের নতুন আবাসভূমি। তারই প্রতিভাস জেগে ওঠে পুরাণ সমূহে, রামায়ণ ও মহাভারতে।

গঙ্গাবতরণের কাহিনী ভারতবাসী হিন্দু

মাত্র সকলেই জানেন। এও জানেন ভগবান শিবের জটা হতে মুক্তিলাভের পর গঙ্গা যখন মর্ত্যে নামেন, সপ্তধারায় প্রবাহিত হন তিনি। পূর্বদিকে যায় তিন ধারা— সুকক্ষু, সীতা ও সিন্ধু। পশ্চি মে গমন করে হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী নামে ত্রিধারা। সপ্তম ধারাকেই রাজর্ষি ভগীরথ নিয়ে আসেন মর্ত্যে। সেখানে গঙ্গার পরিচিতি সুরধনী ছাড়াও "সরিতাশ্রেষ্ঠা" ও "হিমবত সূতা" (হিমালয় কন্যা)। বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্র এ বিষয়ে পিছিয়ে নেই। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্য মিলিন্দ পঞ্চ কে দেখা গেছে গঙ্গা প্রশস্তি। পন্ডিতদের অনুমান গঙ্গা শব্দের উদ্ভব সংস্কৃত গম্ ধাতু হতে। অর্থাৎ যা গমনশীল। পন্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ বঙ্গীয় শব্দকোষে বলেছেন, গঙ্গা শব্দের উৎপত্তি গদগদ হবে। গদগদ বা গঙ্গার শব্দের প্রকৃত অর্থ যা কুলকুল ধ্বনি তুলে বয়ে যায়। বাস্তবে এই ধ্বনির পরিচয় পাওয়া যায় হৃষীকেশ ও হরিদ্বারে গঙ্গার বহতিধারায়।

বিশ্বের সর্বজনবিদিত আর্যাবর্তের এই প্রাণদায়ী স্রোতস্বিনীর উৎপত্তি উত্তরাঞ্চ লে উত্তর গাড়োয়াল হিমালয়ের গোমুখ হতে। সমস্যা দেখা দিচ্ছে অন্যত্র। কোনও কোনও পুরাণ বলছে উৎপত্তি পদ্ম সরোবর বা অনন্তহ্রদ হতে। বর্তমান গবেষকদের ধারণা এই পদ্ম বা অনন্ত সরোবর তিববতের মানস সরোবরের প্রাচীন নাম। রাজর্ষি ভগীরথ মানস সরোবরের একটি ধারাকে দক্ষিণে
গাঙ্গোত্রী হিমবাহের সঙ্গে যুক্ত করে গঙ্গাকে গোমুখ দিয়ে নির্গল করান। তদনুসারে রাজর্ষি ভগীরথ নিশ্চ য়ই গঙ্গোত্রী হিমবাহর দিকে যাওয়া কোনও খাতের সন্ধান পেয়েছিলেন। তন্ত্রভিলাষীর সাধুসঙ্গের লেখক প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ' গ্রন্থে মানস সরোবরের থেকে উৎপত্তির কথা বলেছেন স্থানটি দর্শন করে।

গঙ্গা যে ঔপনিষদিক যুগ থেকে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পেয়ে এসেছে আর্যাবর্ত ভারতে, তার কিছু সাক্ষ্য মেলে বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ থেকে। মেগাস্থিনিস, (খৃঃ পূ ৩ য় অব্দ) ষ্ট্রাবো (যীশুখৃস্টের সমসাময়িক) ও এরিয়ান (প্রথম খৃস্টাব্দ) সকলেই নিজেদের পরিকব্রাজন গ্রন্থে গঙ্গাকে ভারতের সর্ববৃহৎ নদী বলেছেন। এরিয়ান অবশ্য গঙ্গার সপ্তধারার কথা লিখেছেন। স্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন পাশ্চাত্য পর্যটক টলেমি। তিনি হিমালয় থেকে গঙ্গার বহমানতার পূর্ণ বিবরণ দাখিল করেছেন।

গঙ্গার পাবনী শক্তির মূলে আছে তার অদৃশ্য ওষধিগুণ। ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্র শিরোমণি মহর্ষি চরক বলেছেন — হিমালয় উদ্ভূতা গঙ্গার জল অসাধারণ পথ্য। একাদশ শতাব্দীর আর এক প্রসিদ্ধ ভেষজ বিজ্ঞানী চক্রপানি দত্তর (১০৬০ খৃঃ) অভিমত — হিমালয় হতে উৎপন্নহেতু গঙ্গাজল মহাপথ্য স্বরূপ। পুনার ভান্ডারকার রিসার্চ ইনিস্টিটিউটে রক্ষিত প্রাচীন পুঁথি "ভোজন কূতুহলে" গভীর প্রত্যয়ের সাথে বলা হয়েছে গঙ্গা বারির সঞ্জীবনী শক্তির কথা। পুঁথিতে উল্লেখিত হয়েছে গঙ্গাজল রুচিকর, স্বচ্ছ, সুপথ্য, স্বাদু, পাচনক্রিয়া বর্ধক, পিপাসা শান্তকারী ও মোহবিনাশক। আধুনিক বিজ্ঞানীরাও
গঙ্গাজলের ভেষ জগুণ বিষয়ে অসন্দিহান। গঙ্গার এই অপার পাবনী শক্তি, রোগহরণের ক্ষমতা যে কল্পনাবিলাস নয়, আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতো ভারতীয় ঋষিরা বহু আগে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেই নিরীক্ষণের ধারা বয়ে চলেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। বিচ্ছুরিত হয়েছে সাধক কবিদের কাব্য ব্যঞ্জনায়। আদি শঙ্করাচার্যের গঙ্গাস্তব তো বিশ্ববিশ্রুত। কিন্তু কজন জানেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের সেই মুসলমান দরবেশ দরাফ খাঁর সংস্কৃতে রচিত গঙ্গাস্তবের কথা। তাঁর একটি পক্তিতে তিনি এই সুর নদীকে বলছেন — সুরধনী মুনিকন্যে তারয়েঃ পূণ্যবন্তং। স তরতি নিজ পূনৈস্ তত্র কিংতে মহত্তম/যদি চ গতি বিহীনং তারয়েঃ পাপীনং মাং, তদিহ তব মহত্বং ত্বন্ মহত্বং মহত্বম।

অর্থ হল — হে মুনিকন্যে সুরধনী। পুণ্যবান তো তরে যায় নিজ পুণ্যে। তাতে তোমার কৃতিত্ব কোথায়? যদি নিরুপায় আমার মতো পাপীকে তরাতে পারো, তবেই তো কৃতিত্ব
তোমার।

নিরাময়ে সঙ্গীত

ভারতীয় সঙ্গীতে নিহিত রোগ হরণের ক্ষমতা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

গানের সুরে বা বাজনার ছন্দে অসুস্থ শরীর কিংবা মন ভালো হয়ে যায়। এ প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় মিউজিক থেরাপি। হোমিওপ্যাথির জনক হ্যানিম্যান প্রথম বলেছিলেন, মন থেকে রোগ হয়, তাই মন থাকলে অনেক রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে সুরের আলাদা সংজ্ঞা আছে। তা হল 'শব্দ আর ছন্দ বা তালের বাড়াবাড়ি বাদ দিলে যা বেরিয়ে আসে, সেটাই আসল সুর। থেরাপির কাজে এই সুরটাই লাগে। সঙ্গীত সমালোচক রাঘব মেননও এই থেরাপি নিয়ে বিশদে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছেন। তিনি বলেছেন, "গান ও সুর যদি শুধুমাত্র কান না শুনে শরীরের সমস্ত অনুভূতি শুনতে থাকে, তবে সেটাই হল প্রকৃত সুর।"

দিল্লীর অ্যাপেলো হাসপাতালের কনসালট্যান্ট ডাঃ সঞ্জয় চুঘ। মিউজিক থেরাপি নিয়ে ইতিমধ্যে তিনি কাজ শুরু করে দিয়েছেন। তাতে জানা গেছে, 'হতাশ বা জীবন সম্পর্কে উদাসীন অথবা বীতশ্রদ্ধ এই সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে জীবনে ফিরিয়ে আনার কাজে যথেষ্ট উপকারী মিউজিক থেরাপি। আমি চিকিৎসার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি, মানসিক সমস্যার ক্ষেত্রে মিউজিক থেরাপি বিশেষ উপকারী। শরীরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুরের কী অপরিসীম প্রভাব পড়তে পারে সে সম্বন্ধে নৃত্য সমালোচক আশিস খোকার বলেছেন — বদহজম , রিউম্যাটিক আর্থাইটিস হাইপারটেমার — আহির বা ভৈরব, আশাবরী — আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, বাগেশ্বরী — অনিদ্রা, বসন্ত বাহার — গলব্লাডারের স্টোন, ভীম পলশ্রী — উদ্বেগ, হাইপার টেনশন, বৃন্দাবনি

সাঁঝ — ডিপ্রেশন দরবারি, অনিদ্রা। আশিসবাবু পরীক্ষা করে দেখেছেন 'অ্যাকোরিয়াম' ভর্ত্তি লাল-নীল সবুজ মাছগুলোকে মিউজিক সিস্টেমে গান চালিয়ে শোনানো হয়েছিল। দেখা গেল সুরের ছন্দে মাছগুলো তালে তালে চলছে। মনে রাখতে হবে মাছেরা শুনতে পায় না। তাহলে চলাফেরা বদলাল কী করে? সুরের কম্পনে। ওই কম্পন জলে মিশে মাছগুলোর চলার গতি পরিবর্তন করে দিল। মাছেদের ক্ষেত্রেই যদি এই হয়, তাহলে মানুষ তো শুনতে পায়। তার মস্তিষ্কে সুরতরঙ্গ কী অসাধারণ কাজ করতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

মানসিক বিশ্রাম তথা ধ্যানের কাজে সহায়স্বরূপ সঙ্গীত ও সুরের গুরুত্ব দিন দিন বেড়েই চলছে।

মিউজিক থেরাপির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মধ্যে সাম্প্রতিককালে যোগ হয়েছে অপারেশন থিয়েটারে সাফল্য।

প্রি-ম্যাচিওর শিশুদের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত কার্যকরী আশ্চ র্য এক আবিষ্কার করেন অ্যাটল্যান্টা জার্জিয়ায় পিয়ে ভমন্ট হাসপাতালের প্রসূতি ও শিশু বিভাগের ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটের ডাক্তার শোয়োটার্জ। তিনি দেখিয়েছেন মাতৃ- জঠরে শব্দস্তরে আশি থেকে পঁচানব্বই ডেসিবলের মতো থাকে। অনেকটা শনিবার রাতের ডিস্কো থেকে আওয়াজ মায়ের গর্ভে রক্তসঞ্চ ালন, হৃদতরঙ্গ, শ্বাস-প্রশ্বাস মিলিয়ে ওই আওয়াজ হতে থাকে। জন্মের পর বাইরের পৃথিবী শিশুটির কাছে আরো শান্ত। হঠাৎ করে এই শব্দ বৈষম্য অনেক সময় শিশুর মানসিক গঠনটা এলোমেলো করে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে মিউজিক থেরাপি বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে। সর্বোপরি একথা অনস্বীকার্য যে, সুর ও সঙ্গ ীতের মেলবন্ধনে একজন মানুষ যে কোনও অবস্থায় যে কোনও সময় সুস্থ থাকতে পারে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও অর্জন করতে পারে।

নারীর মূল্যায়ণে যান্ত্রিক সভ্যতা

অরুণা মুখোপাধ্যায়

বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে জীবন-যাপনের অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে যে আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যে ইন্টারনেট আমাদের যেমন

ভবিষ্যৎ প্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে — যেটা আমাদের কাছে অভিনন্দনসূচক, ঠিক তেমনিভাবেই কিছু ক্ষেত্রে নারীর মূল্যায়ণে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে একটু দূরত্ব রচনা করে দিয়েছে।

আইনজীবীর দৃষ্টিতে দেখেছি পুরুষ ও নারী উভয়েই বিবাহিতই হোন অথবা অবিবাহিতই হোন, তাঁরা একে অপরের আইনসিদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী শান্তিরূপী সম্পর্ক ছেড়ে একে অপরকে বাজারের সামগ্রীর মতো গুণের তুলনামূলক সমালোচনা করে ইন্টারনেটের অদৃশ্য বন্ধু বা বান্ধবীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে ভবিষ্যত ঘর গড়ার জন্য অথবা বর্তমান ঘর ভাঙার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠছেন।

কিছুদিন আগে একটি সম্ভ্রান্ত বিবাহিতা মহিলা নাবালক সন্তানসহ আমার কাছে এসে জানান যে, তিনি একটি ছেলেকে ভালবেসে বিয়ে করে খুশি হয়েছিলেন ও সংসারে তাঁর পুরোপুরি শান্তি ছিল। কিন্তু ইদানীংকালে তিনি তাঁর স্বামীকে দেখছেন দাম্ভিক, ক্রোধপরায়ণ ও জেদী। মাঝে মাঝে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারও করছেন, যেটা আগে মোটেই ঘটতো না। তখন স্বামী খুবই ভালবাসতেন স্ত্রীকে এবং তাঁর প্রতি কোনও সন্দেহই ছিল না। — "আপনার স্বামীর হঠাৎ এই পরিবর্তনের কারণ কি হতে পারে বলে

আপনার মনে হয়?" প্রশ্ন করেছিলাম তাঁকে। ভদ্রমহিলা এবার কান্নাভরা গলায় সত্য কথাটা আমতা আমতা করে বলেন — "সম্প্রতি ইন্টারনেটে একটি ছেলের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। ছেলেটি আমার স্বামীর থেকেও অনেক অনেক সুন্দর করে মিষ্ট ভাষায় কথা বলতে জানেন। আমিও তাই ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বহুক্ষণ সময় ধরে কথা বলতাম প্রায়দিনই। এটাই সন্দেহের কারণ হয় স্বামীর। আমাকে তাই ছেলেটির সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে কথা বলতে নিষেধ করেন ও তাঁর কথা না শোনাতেই আরম্ভ হয় আমাদের পারিবারিক অশান্তি।"

— "আপনি তো একজনের বিবাহিতা স্ত্রী; নিজের ঘর ছেড়ে আবার কি অন্য জনের সঙ্গে ঘর বাঁধতে আগ্রহী নাকি আপনি?" ভারতীয় নারীর বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সেদিন প্রশ্ন করছিলাম।

— "একি বলছেন দিদি? আজকের যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে যদি ভাল সুযোগ পাই তাহলেও কি সনাতনী শিক্ষায় স্বামীর পায়ে মাথা দিয়ে পড়ে থাকবো নাকি।" মেয়েটির গলার স্বর সেদিন উগ্র হয়ে উঠেছিল।

সেদিন বুঝেছিলাম মেয়েটি আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। তাই তার সিদ্ধান্তে ব্যাঘাত ঘটাতে গেলে আমার মতো আইনজীবীরাও যে হেরে যাবেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই বুঝেছিলাম।

আর একটি ঘটনা। একটি নিরীহ কর্তব্যনিষ্ঠ সরল প্রকৃতির স্বামী আমাকে এসে জানান যে সম্প্রতি তাঁর স্ত্রী ইন্টারনেটে একটি ছেলেকে এতটাই ভালবেসে ফেলেছেন যে ওই ছেলেটির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তাঁর সময়ের মাত্রা হারিয়ে যায়। অথচ স্বামীকে জানান যে, ওই ছেলেটিকে তিনি ছেড়ে দেবেন। কিন্তু ছাড়া তো দূরের কথা ওই ছেলেটিকে দিয়েই স্বামীকে হুমকী দিচ্ছেন যে "ভাল চাস তো তোর স্ত্রীকে ছেড়ে দে, নইলে তোর বিপদ আছে।" ওই স্বামী সেদিন নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আমার কাছে যে আইনী উপদেশ চেয়েছিলেন, সেই উপদেশ তাঁকে যথাযথভাবে বুঝিয়ে দেওয়ায় তিনি খুশি হয়েছিলেন।

আর একটি ঘটনা। একবার এক বিবাহিত স্বামী তাঁর স্ত্রীর বহু নির্গুণের কথা শুনিয়ে ও স্ত্রীর বহু দুর্ব্যবহারের কথা জানিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে দ্রুত ডিভোর্স ঘটানোর জন্য পীড়াপীড়ি করেন।

(এরপর ১৩ পাতায়)

চিত্রকথা ।। অমর শহীদ মহান বিপ্লবী বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে ।। ৬

বুদ্ধ দেব বসু ঃ শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি

(৯ পাতার পর)

অবক্ষয় ও অবলুপ্তি। পুরনো সভ্যতার অবলুপ্তির সমাধিক্ষেত্রে রোপিত হয় নতুন সভ্যতার বীজ। এটাই ভারতীয় দর্শনের মূল কথা। বুদ্ধ দেব বসু প্রকৃত পরিচয় কী? তিনি কবিতা লিখেছেন, গল্প উপন্যাস লিখেছেন, নাটক কাব্যনাটক লিখেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর জন্মস্থান কুমিল্লা। মাতা বিনয় কুমারীর তিনিই প্রথম ও শেষ সন্তান। কারণ তাঁর জন্ম মুহূর্তেই ধনুষ্টংকারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন মাতা।

নোয়াখালিতে প্রাথমিক স্কুলের পাঠ শেষে কিশোর বুদ্ধ দেব ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিলেন ঢাকায় এসে। অধিকার করলেন প্রথম বিভাগে পঞ্চ ম স্থান। ইন্টার মিডিয়েট-এ আর্টস থেকে প্রথম বিভাগে মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজিতে বি এ অনার্স প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান। ১৯৬৩-তে বুদ্ধ দেব বসু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে যান। সেখানে তিনি বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় তুলনামূলক ইন্দো-ইউরোপীয় এপিক বিষয়ে পাঠদান করেছেন। যেহেতু সাহিত্য ছাড়া আর কিছু বিবেচ্য ছিল না বুদ্ধ দেব বসুর, তাই সাহিত্যের শিল্পমূল্যের ব্যাপারে তিনি ছিলেন আপসহীন। ১৯৩০ থেকে ১৯৫০ — এই কুড়ি বছরের মধ্যে লিখতে হয়েছে অন্তত পঁচিশটি বই, পরবর্তীকালে ১৯৫১ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত ছেষট্টিটি বই।

শব্দের মাধ্যমেই বুদ্ধ দেব বসু শ্রুতি ও স্মৃতিনন্দন আত্মীকরণ সম্পন্ন করেছেন কবিতায়। এক্ষেত্রে তিনি দীর্ঘ কালসূচক বাক্যাংশ যেমন ব্যবহার করেছেন তেমনি ব্যবহার করেছেন গভীরতাসূচক বাক্যাংশ। কবিতার সৃজনশীল দায় মেটানোর জন্য দরকার বোধ ও বুদ্ধি র বৃত্ত, দরকার শব্দের ত্রিভুজত্ব। আর তা হলেই শব্দের ঘনত্বের কাজটি যেমন সম্পন্ন হয় তেমনি সম্পন্ন হয় শব্দের জ্যোতির্ময়তার কাজটি, শব্দের অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা সৃষ্টি সম্ভব হয়। যা বুদ্ধ দেব বসুর কবিতায় অবিভাজ্য হিসেবে বিবেচিত।

ভুল ভ্রান্তি

(৯ পাতার পর)

এমন সময় সমরবাবু দেখেন তার বন্ধু রোহিণীবাবু একটি টিফিন কেরিয়ার নিয়ে আসছেন। তিনি কাছে এলে সমরবাবু বললেন — কি দাদা, কোথায় যাচ্ছেন?

রোহিণীবাবু বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন — আর বলবেন না। আমার ছেলেটা সেই সকাল থেকে স্টেশনে সন্ত্রাসবাদীর অপেক্ষায় বন্দুক নিয়ে বস্তাবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে! এ কথা শুনেই সমরবাবুর মাথায় হাত— কি বলছেন দাদা, সন্ত্রাসবাদীদের জন্য এত কষ্ট করতে হয়। তাদের একটা ডাক দিলে তো ওরা দশটা হাঁক দেবে। এতো নতুন প্রোডাক্ট। সারা পৃথিবীর বাজারে চলছে। চলছে তাই আর্থিক মন্দা। তবে বাজারে আর নতুন দু' চারটে সন্ত্রাসবাদ আমদানী হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। দামী জিনিস তো, ছেলেটাকে দু-চারমাস একটু কষ্ট করতেই হবে। অর্থাৎ বস্তা ছিঁড়ে বালি যে কয়দিন না পড়বে ততদিন আর কী করা যাবে।

রোহিণীবাবু এমন রসিকতায় রেগে আগুন। তিনি বললেন — একেই বলে কারো সর্বনাশ, কারো পৌষ মাস। পিঠে পায়েস খান বসে আপনারা। আমি চললাম।

এভাবেই চলছে সমরবাবুর জীবন। বাইরে এলেই হাসিখুশির গল্পে মশগুল। ঘরে এলেই চুপচাপ। আসলে ঘরে একটু সংসারের আর্থিক চাপ আছে তো। তাই ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে যতো অশান্তি। এইটুকু না থাকলে সব মিলে মিশে একাকার। অতএব হাসি। সমরবাবুর চাই অফুরন্ত হাসি। তাই এমনি সব রসিকতা।

শকিং, কিন্তু কেন?

ব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

সদ্য সমাপ্ত পঞ্চ দশ লোকসভা নির্বাচনে এ রাজ্যে সি পি এম দলের নির্মম পরাজয় এখনও সম্পূর্ণ প্রকাশ হয়নি। বিভিন্ন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলির সর্বভারতীয় আসন ভিত্তিক জয়-পরাজয়ের খণ্ডচিত্র আভাসিত হতে শুরু করেছে মাত্র। বেলা ১২টা নাগাদ উত্তর কলকাতা ক্ষেত্রের দোর্দণ্ডপ্রতাপ সাম্প্রদায়িক প্রার্থী মহম্মদ সেলিম অনেকটাই আন্দাজ করে নিতে পেরেছিলেন আসন্ন মহামারীর ভয়াবহতা। এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, এ ফলাফল 'Shocking', Shocking কথার অর্থ বহুমাত্রিক। একেবারে সহজ অর্থ 'যা ভাবা যায় না'। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন?

গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতিতে জয়-পরাজয় খুবই স্বাভাবিক ঘটনা এবং তা একান্তভাবেই যুযুধান দল ও তার প্রার্থীদের কাজ-কর্ম্ম, সুনাম-দুর্নাম, জনপ্রিয়তা, গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি জাগতিক দৃশ্যমান ঘটনাবলীর ওপরেই নির্ভর করার কথা। এগুলির কম বা বেশি থাকার ভিত্তিতেই প্রার্থী বা দলের সাফল্য ব্যর্থতা নির্ভরশীল হওয়া উচিত। কিন্তু Shooking কথার অর্থ কোনও আধিভৌতিক ঘটনাকে ইঙ্গিত করে।

এই প্রসঙ্গে সর্বভারতীয় নির্বাচন চিত্রের দিকে নজর দিলেই দেখা যাবে যে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল হিসেবে কংগ্রেস ও বিজেপি উভয়েই বহু রাজ্যে সফল আবার অনেকগুলিতে ব্যর্থ হয়েছে। এই জয়-পরাজয় নির্বাচন পদ্ধতি ও গণতন্ত্রের দৃঢ়তাকেই প্রতিষ্ঠিত করে। কংগ্রেস রাজস্থানে ২০০৪ সালের ফল উল্টে দিয়ে ২৫টি-র মধ্যে ২১টি আসন জিতেছে। আবার কর্ণাটকে বিজেপি ২৮টি-র মধ্যে ১৯টি জিতেছে। বিহারে বিজেপি জোট ৪০টির মধ্যে ৩০টি আসন জিতেছে। এই ওলট-পালটই ভারতীয় গণতন্ত্রের গৌরব। নির্বাচক মণ্ডলীর ক্ষমতার মানদণ্ড। উল্লেখিত রাজ্যগুলির ফলাফলে বিজয়ী এবং বিজিত দল নিশ্চয়ই উল্লসিত বা হতাশ বোধ করেছেন আর সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু উভয় দলের কাউকেই বা সেই হিসেবে গোহারা হেরে যাওয়া লালু প্রসাদকেও 'Shocking' কথাটি প্রয়োগ করতে দেখা যায়নি। কিন্তু কেন? এর উত্তর একটু বিশদে খোঁজা দরকার, কেননা পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ ৩২ বছর পরে যে অচলায়তন ভেঙ্গে পড়েছে তা সব অর্থেই যুগান্তকারী বা ঐতিহাসিক তা স্বীকার করতে কোনও দ্বিধা নেই। এই জয় কোনও রাজনৈতিক দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে তাৎপর্য সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাত হবে না। কেননা ভবিষ্যতে কী ঘটবে তার আন্দাজ না করে শুধু এটুকুই যথেষ্ট হওয়া উচিত যে এ রাজ্যে গণতন্ত্রের নবজাগরণ বা পুনরুত্থান ঘটেছে। ভারতীয় জনতা পার্টির সংযোগ গৃহীত হলে তা আরও বিধ্বংসী হয়ে যেতে পারত।

তবুও শুরুর Shocking কথাটি কেন? অর্থাৎ ভাবা যায় না কেন? কেননা প্রচলিত অর্থে নির্বাচনের সঙ্গে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার যে প্রত্যক্ষ প্রতিফলন দেখা যায় — এ রাজ্যের শাসকদলের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। সেই যোগসূত্র তারা নিপুণ কৌশলে বহুদিনই ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর সেই কারণেই তারা নিঃশঙ্ক, নিশ্চিত ও নির্ভয় যার ফলে তারা যুগ-যুগান্ত ব্যাপী নির্বাচন জিতে বলবেন তাঁরা জনতার রায়ে সরকার চালাচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে Scientific Rigging-এর কথা এ রাজ্যের সব মানুষের কাছে পরিচিত হয়ে গেছে — আর শাসক দল যাকে ক্রমাগত বিদ্রূপ ও অস্বীকার করলেও ভোটে জিতে রোজগার করে খাওয়ার ক্ষেত্রে তাকে এক বন্দস্তুত্তপ্তপ্তঙ্ক-তে পরিণত করেছে — তার স্বরূপ ও আংশিক নিধন এই নির্বাচন প্রত্যক্ষ করেছে।

একটি লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধান সভায় প্রত্যেকটিতে কম বেশি ২ লক্ষ ভোটদাতা থাকেন আর সেই হিসেবে ৭টি ২ লক্ষ ঞ্চ ১৪ লক্ষ বা কোথাও ১০/১২ লক্ষ্য ভোটার নিয়ে ১টি লোকসভা হয়। এই ভোটদাতারা আবার এক একটি বুথে কম বেশি ৯০০ থেকে ১২০০-র মধ্যে বিভাজিত হয়ে যান। সেই হিসেবে ১৪ লক্ষ সর্বোচ্চ ভোটার ধরে (কোথাও ১/২ লাখ কম হতে পারে) মোটামুটি বুথ ভিত্তিক ১০০০ ভোটার ধরলে প্রতি লোকসভা কেন্দ্রে ১৪০০ বুথ থাকে। ১৪০০ × ১০০০ (ভোটার) = ১৪০০০০০ (চোদ্দ লক্ষ) ভোটদাতা। সি পি এম দল-এর মধ্যে এলাকার সংগঠন, গুন্ডা, অস্ত্র শস্ত্রের মজুত, দলীয় হার্মাদ এবং পুলিশের সহযোগিতা ভিত্তিক আনুমানিক শতকরা মাত্র ১০ ভাগ অর্থাৎ ১৪০টি বুথকে Target করে যা ১টি বা ২টি বিধানসভার মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ প্রায় দেড় লাখ ভোট — ৮০% ভোট হলে ১.২০ লাখ ভোট পড়ে। লোক দেখানোর খাতিরে বাকি অনেক বুথই তুলনামূলকভাবে কম উপদ্রুত থাকে। প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রে এই ধরনের আক্রান্ত বুথগুলির ফলাফল দেখলে নিশ্চিত হওয়া যায় যে ওই প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৯০ ভাগ তারা লুঠ করে নেয় — এবং যার ফলে মাত্র একটি বা দুটি বিধানসভা কেন্দ্রেই তারা বিরোধী প্রার্থীর থেকে ৮০/৯০ হাজার ভোটে এগিয়ে যেতে পারে। বাকি ৫টি বিধান সভা কেন্দ্রে অপেক্ষাকৃত কম রিগিং বা অনেক জায়গায় সঠিক ভোট হলেও প্রার্থী কিছুতেই ওই লিড কভার করতে পারে না। সরকারি কর্মী হিসেবে ভোট প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতার সূত্রে বলতে পারি ওই আক্রান্ত বুথের Presiding officer বা কেউই বিরূপ রিপোর্ট দেন না কেননা সরকারি ঝামেলায় পড়তে চান না। এই প্রসঙ্গে হাওড়া সদর কেন্দ্রের কুখ্যাত বালী ও হাওড়ার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র উল্লেখ্য যেখান থেকে ২০০৪ সালে বিজয়ী স্বদেশ চক্রবর্তী ১ লক্ষ ৭ হাজার ভোটের যে লিড নিয়েছিলেন অন্য ৫টি বিধান সভায় বিজিত প্রার্থী তা অতিক্রম করতে পারেনি। এটি একটি Model case যা বহু জায়গায় অনুসৃত।

এমনটাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে চলে আসবে জেনেই হিসেবী সেলিমের মতো বহু সি পি এম প্রার্থীই নিঃশঙ্ক ছিলেন। (যেমন Rig-master অমিতাভ নন্দী) ইনি ফল বের হবার আগে সকালে বিজয় মিছিল বার করেছিলেন। কিন্তু এবারের মানুষের সক্রিয় প্রতিরোধে বহু স্থানে রিগিং-এর তীব্রতা ও সন্ত্রাসের সাফল্য চুরমার হয়ে যায়। উল্লেখিত হাওড়া কেন্দ্রের কুখ্যাত ২টি বিধান সভার মিলিত লিড ৫৫ হাজারে নেমে আসে (আংশিক রিগিং আক্রান্ত হওয়ায়)। অন্য ৫টি ক্ষেত্রে বিজয়ী অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের চেষ্টায় রিগিং রুখে 'ডেফিসিট' কভার করেন ও প্রকৃত লিড নিয়ে ৩৮০০০ ভোটে জেতেন। এটি একটি নমুনা কেন্দ্র মাত্র। রাজ্যের বহু জায়গায় মানুষের তীব্র ঘৃণা ধিক্কার আতঙ্ক সমস্ত বাধা টপকে প্রতিরোধ গড়ে তোলে যা একনিষ্ঠ Rigger CPM দলের সমস্ত Mathematical Calculation গোলমাল করে দেয়। তাই লুঠ অঙ্কে মেধাবী কিন্তু আদ্যন্ত জোচ্চুরি নির্ভর সাম্প্রদায়িক সেলিম বলেন Shooking¼

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এমন Shoock রাজ্যের ২৭টি কেন্দ্রে সি পি এম বা বাম প্রার্থীরা খেয়েছেন। মানসিক রোগীরা ঞ্চড্রস্তুঙ্ক - এর পর দীর্ঘ সময় ঘোরের মধ্যে প্রায় অসাড় থাকে — বাস্তব পরিস্থিতি, কার্যকারণ অনুধাবন করতে পারে না। এরাও পাচ্ছেন না। প্রকৃত কারণ এড়িয়ে গিয়ে কেউ বলছেন তৃতীয় ফ্রন্ট-এর ঠগবাজী লোকে ধরে ফেলেছে। তাতে এ রাজ্যের বাঙালী ঠগদের পিঠ বাঁচে। আবার দিল্লীর নিকম্মারা অন্য রাজ্যে শাসক কংগ্রেস বা বিজেপি-র রাজ্য ধরে রাখার সাফল্য দেখিয়ে বলছেন — "তোরাই নিশ্চয় পশ্চিমবঙ্গের লোককে ভাঁওতা দিয়েছিস, নইলে ওরা জিতল কি করে?"

আসলে নিঃসীম ঘৃণা প্রতিহিংসা অসহায়তা থেকে নিরস্ত্র মানুষ অত্যাচারী, নিষ্ঠুর মনুষ্যত্বহীন Stalinist, subjugation-এ বিশ্বাসী শাসকদলের বিরুদ্ধে যে নির্মম Shock Therapy প্রয়োগ করেছেন তাতে এই দিল্লীর ক্ষমতা হারানো উচ্ছিষ্টভোগী দল বহুকাল অসাড়ই থাকবেন।

বঙ্গ মনীষার দৃষ্টিতে শিবাজী

একতাহীন, নানা খণ্ড রাজ্যে বিচ্ছিন্ন, মুসলমান রাজার অধীন, এবং পরের চাকর মারাঠাদের ডাকিয়া আনিয়া শিবাজী প্রথমে নিজ কার্যের দ্বারা দেখাইয়া দিলেন যে তাহারা নিজেই নিজের প্রভু হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে। তাহার পর স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি প্রমাণ করিলেন যে, বর্তমানকালের হিন্দুরাও রাষ্ট্রের সব বিভাগের কাজ চালাইতে পারে। শাসন প্রণালী গড়িয়া তুলিতে, জলে স্থলে যুদ্ধ করিতে, দেশে সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টি করিতে, বাণিজ্যপোত গঠন ও পরিচালনা করিতে, ধর্মরক্ষা করিতে, তাহারা সমর্থ; জাতীয় দেহকে পূর্ণতা দান করিবার শক্তি তাহাদের আছে।

"শিবাজীর চরিত্র কথা আলোচনা করিয়া আমরা এই শিক্ষা পাই যে, প্রয়াগের অক্ষয় বটের মতো হিন্দু জাতির প্রাণ মৃত্যুহীন, কত শত বৎসরের বাধা বিপত্তির ভার ঠেলিয়া ফেলিয়া আবার মাথা তুলিবার, আবার তাহার শাখা পল্লব বিস্তার করিবার শক্তি তাহাদের মধ্যে নিহিত আছে। ধর্মরাজ্য স্থাপন করিলে, চরিত্র বলে বলীয়ান হইলে, নীতি ও নিয়মানুবর্তিতাকে অন্তরের সহিত মানিয়া লইলে, স্বার্থ অপেক্ষা জন্মভূমিকে বড় ভাবিলে, বাগাড়ম্বর অপেক্ষা নীরব কার্যকে সাধনার লক্ষ্য করিলে, জাতি অমর অজেয় হয়।

— স্যার যদুনাথ সরকার

৫ জুন জৈষ্ঠ্য শুক্ল ত্রয়োদশী তিথিতে শিবাজীর রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে প্রকাশিত

নারীর মূল্যায়নে যান্ত্রিক সভ্যতা

(১২ পাতার পর)

আমি বুঝেছিলাম স্বামীর কোনও অন্য উদ্দেশ্য আছে যেহেতু তিনি মানিয়ে চলার কাউন্সেলিং না মেনে সম্পর্ক ছেদের জন্য চাপ দিচ্ছেন।

আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হল যখন ভদ্রলোক কথায় কথায় বলেই দিলেন — "দিদি, আপনাকে সত্যি কথাটা বলতে আপত্তি নেই। ইন্টারনেটে এক ইংরাজ বিধবা ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হয়ে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে দুজনে দুজনকে পেতে চাই স্বামী-স্ত্রীর মতো। আমি বিবাহিত জেনেও ভদ্রমহিলা আমার স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্স করার জন্য অনুরোধ করেছেন ও বলেছেন ডিভোর্স করানোর জন্য দেরী হলেও ক্ষতি নেই তবু তিনি অপেক্ষা করে থাকবেন।

নারীর বৈশিষ্ট্য ও নারীর নীতিগত আদর্শের ভিত্তিতে ভদ্রলোককে আমি সেদিন বলেছিলাম "আমি নিজে নারী হয়ে আপনাকে এই আইনগত উপদেশ দিতে পারি না। যাতে আপনি সুস্থ, স্বাভাবিক বিবাহিতা স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে অন্য আর একটি মহিলার সঙ্গে বিবাহে আবদ্ধ হবেন। অনৈতিক ও অবাস্তব চিন্তা ছেড়ে দিয়ে ওই কূট, স্বার্থান্বেষী মহিলার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে আপনার স্ত্রীর কাছে অকপটে সব দোষ স্বীকার করে নিজে মানিয়ে চলতে চেষ্টা করুন, তাতে আপনি নিজেও বাঁচবেন এবং আপনার পরিবারও রক্ষা পাবে।

তাই মনে হয় যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে নারীর মূল্যায়নে আমরা যেন নারীর নৈতিক প্রগতির পথটিকেই সত্যের আলোকে দেখাতে পারি যাতে আমাদের নারীজীবন হয়ে উঠবে সার্থক, সুন্দর ও কল্যাণময়।

জাতির প্রতি বিশ্বাস পুনরুদ্ধারের সময় হয়েছে

(৩ পাতার পর)

আছে। আজকের এই শুরুর দিনে আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা মার্কিন গণতন্ত্রের দুই শত বছরের উত্তরাধিকারী এবং এই উত্তরাধিকার কেবল মাত্র জন্মগত অধিকার নয় — এটি একটি গৌরবময় দায়িত্বভার। এখন আমাদের সকলকে এগিয়ে এসে ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠীতে পরিণত হতে হবে যাতে আমরা এই দায়িত্ব ভারকে বহন করে সামনের দিকে পুনরায় এগিয়ে যেতে পারি।... এই ঘোষণা শেষ হল ২০ জানুয়ারি, ২০০৯-কে "জাতীয় পুনর্জাগরণ ও পুনর্মিলনের দিবস" হিসাবে ঘোষণার মধ্য দিয়ে এবং সকল মার্কিন নাগরিকগণের প্রতি এই ডাক দিয়ে যে আমাদের প্রত্যেককে একে অপরকে সেবা করতে হবে এবং সকলের উদ্দেশ্য হবে এই জাতিকে নতুন শতাব্দীর জন্য পুনর্গঠন করা।

মাত্র দুই শত বছরের অস্তিত্বসম্পন্ন একটি জাতি তার ঐতিহ্যকে গৌরবময় দায়িত্ব বলে মনে করছে। কিন্তু আমরা যারা লক্ষ লক্ষ বছরের অস্তিত্ব নিয়ে একটি জাতি হিসাবে বসবাস করছি, আমরা যারা একটি সনাতন সভ্যতা এবং সর্বগ্রাহ্য সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী তারাই তাদের ঐতিহ্যকে আজ বোঝা মনে করছি। এখানেই রয়েছে ভারতের সর্ব দুঃখের মূল। আবার এখান থেকেই শুরু করা যেতে পারে পুনরুদ্ধারের পালা।

আসুন, আমরা আমাদের রাজনীতিবিদ্ ও তাদের নেতিবাচক পারস্পরিক নিন্দাবাদের রাজনীতি ভুলে যাই। ভুলে যাই তাদের ধার্মিক ঘোষণার আড়ালে অধার্মিক কাজকর্মের কথা।

আমরা কি পারি না একটি জাতিগোষ্ঠী এবং জাতি হিসাবে এই পুনর্জাগরণ ও পুনঃশুদ্ধি করণের কাজে নিজেদের উৎসর্গ করতে? ভারত আত্মার পুনর্জাগরণ ঘটাতে যাতে নব নব উচ্চতায় উঠতে পারি। জাতপাত, আঞ্চলিকবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার মতো সামাজিক বিবাদগুলির পুনঃশুদ্ধি করণ করতে। এই উভয় কাজই আমাদের জাতিয়তাবাদকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাবে এবং এটাই হবে একবিংশ শতাব্দীর উপস্থিত চ্যালেঞ্জ ও সুযোগগুলিকে গ্রহণ করার পথে জাতিকে প্রস্তুত করার প্রথম পদক্ষেপ। মহান প্রাপ্তিগুলি অবশ্যই এই পথে আমাদের অনুসরণ করবে।

[লেখক 'দি পাইওনিয়ার' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক]

খেলার জগৎ

হাউটনের সঙ্গেও বিরোধ লাগল ক্লাব কর্তাদের

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই চিরন্তন বিরোধ, দেশ আগে না ক্লাব বড়? দশকের পর দশক ধরে চলে আসা এই সমস্যার সমাধানকল্পে আজও কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ ও সমাধানসূত্র বের করতে পারল না অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন বা এ আই এফ এফ। যতই ফেডারেশন বার্ষিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করুক ও জাতীয় ফুটবলারদের তালিকা তৈরি করে ক্লাবগুলোকে ধরিয়ে দিক। এ ব্যাপারটা নিয়ে ফেডারেশনের উচিত টেকনিকাল ব্যক্তিত্বদের নিয়ে একটা টাস্কফোর্স গঠন করে সমন্বয় সাধন আর তার সঙ্গে একটা মনিটরিং কমিটি গঠন করা।

বৃটিশ বব হাউটন ভারতের জাতীয় কোচ হবার পর থেকেই তার সঙ্গে দেশী কোচদের সংঘাত শুরু হয়ে গেছে। পরপর দু'বছর (২০০৭, ২০০৮) দু'দুটি মাঝারী মানের আন্তর্জাতিক টুর্ণামেন্টে ভারত তার কোচিংয়ে চাম্পিয়ন হওয়ায় হাউটন ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করেছেন। দেশীয় কোচদের পাত্তাই দেন না বলতে গেলে। সুব্রত ভট্টাচার্য, সুখবিন্দার এরা প্রত্যেকেই জাতীয় পর্যায়ে সফল কোচ। নঈম সুখবিন্দার জাতীয় দলকেও বহু টুর্ণামেন্টে কোচিং করিয়েছেন। দিল্লীতে ফুটবল হাউসে তাদের সঙ্গে হাউটনের বৈঠক একপ্রকার ব্যর্থই হয়। তাদের কোনও পরামর্শই মানতে চাননি হাউটন। একমাত্র সুভাষ ভৌমিক হাউটনকে সার্টিফিকেট দিয়ে বলেছেন কিছুটা হলেও ভারতীয় ফুটবলকে এশিয়া পর্যায়ে একটা বৃত্ত রচনা করার রাস্তা করে দিয়েছেন হাউটন।

কিন্তু হাউটন 'ভিশন এশিয়া, ২০১১' নামক যে প্রজেক্টের পিছনে ধাওয়া করছেন, তা কখনই বাস্তবে সফল হবে না বলে সুভাষও মনে করেন। ক্লাব ফুটবলকে মেরে ফেলে জাতীয় দল বেঁচে থাকতে পারে না। হাউটনের পরিকল্পনা অনুযায়ী এশিয়া কাপের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা পাওয়া ভারত মাঝের দু'বছরে ২০-২৫টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলবে। তারপর ২০১১-তে গিয়ে মোটামুটি তৈরি হয়ে এশিয়া কাপের ফাইনাল রাউন্ডে নামবে। আর এই দু'বছরে মাত্র ২০-২৫টি ম্যাচের জন্য জাতীয় দলের সব ফুটবলারকে বছরের অধিকাংশ সময়ে জাতীয় শিবিরে থাকতে হবে।

ঠিক এ জায়গাতেই আপত্তি ক্লাব কর্তাদের। সম্প্রতি ফেডারেশনও দেশের সবকটি বড় ক্লাবের জাতীয় ফুটবলারদের তালিকা প্রকাশ করেছে। তা ধরিয়েও দেওয়া হয়েছে ক্লাব কর্তাদের হাতে। বলা হয়েছে বছরের মধ্যে প্রায় ২০০ দিন এরা জাতীয় শিবিরে থাকবে। এদিকে ক্লাব কর্তারা বলেছেন, ফিফা অনুমোদিত নয় এমন টুর্ণামেন্টে খেলার জন্য ও তার প্রস্তুতি হিসেবে ক্যাম্প করার জন্য ফুটবলার ছাড়বে না। হক্ কথা। ক্লাব কর্তারা মোটা অর্থের বিনিময়ে ফুটবলারদের সঙ্গে চুক্তি করে। তাদের জীবন বিমা ও মেডিকেল বিমাও করানো হয়। তাহলে তারা কেন ক্ষতি স্বীকার করবে? ক্লাবগুলি এখন বলছে, যেসব

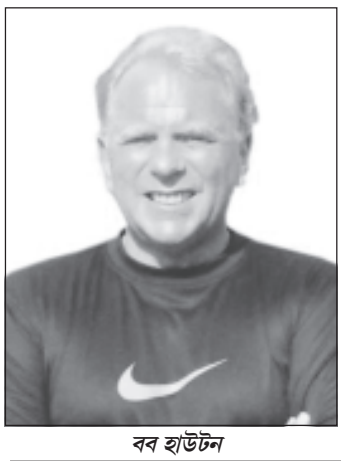

বব হাউটন

ফুটবলার ক্যাম্পে চলে যাবে তাদের মাইনে কাটা হবে দিন প্রতি হিসেব করে। অন্যদিকে ফেডারেশন বলছে, ক্যাম্পে না এলে জাতীয় দলের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে উভয় সঙ্কটে ফুটবলাররা। তাদের দাবি ক্লাব তাদের চুক্তি অনুযায়ী দিন প্রতি ক্ষতির হিসেবে টাকা কেটে নিক। সেই ক্ষতিটা পুষিয়ে দিক ফেডারেশন। ফেডারেশন এখন স্বাবলম্বী। বহু স্পনসর এসেছে তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। তাহলে ফুটবলারদের টাকা দিতে কার্পণ্য করা কেন। দেশের হয়ে বছরে এক-আধটা টুর্ণামেন্ট খেলে কী এমন আয় হয় তাদের? তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে তো ক্লাবগুলিই। চাকরিও জোগাড় করে দেয় ক্লাবগুলিই। তাই ক্লাবের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকা স্বাভাবিক। আবার দেশের হয়ে খেলা সবচেয়ে গৌরবের ব্যাপার, সেই ব্যাপারটা মাথায় রেখে শিবিরে যেতেও বাধ্য হয়। তাই ফেডারেশন ও ক্লাবকর্তাদের উচিত পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে একটা চীরস্থায়ী সমাধান সূত্র বের করা।

বব হাউটন কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল। তিনি মোটেও জাতীয় ফুটবলারদের ক্লাবের হয়ে খেলতে দিতে চান না। পরিবর্তে তাদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ কীভাবে হবে সে ব্যপারেও তার কোনও মাথা-ব্যথা নেই। তিনি তো বিশ্ব ফুটবলে অগ্রণী দেশ থেকে এসেছেন। কোচিং করিয়েছেন সুইডেনের মতো দেশে। দেখেছেন ওইসব দেশে জাতীয় ফুটবলারদের সামাজিক ও আর্থিক গুরুত্ব ও অবস্থান। তাহলে কেন তিনি ফেডারেশনকে বলছেন না জাতীয় ফুটবলারদের জন্য মোটা টাকার 'ইনসেনটিভ স্কিম' চালু করতে, যতদিন তারা দেশের হয়ে খেলবেন বা ক্যাম্পে থাকবেন। হাউটন তো ফেডারেশনের 'ব্লু আইড বয়'। তাকে যথেষ্ট সম্ভ্রম ও গুরুত্ব দেয় ফেডারেশন কর্তারা। তার কথা ফেলতেও পারবেন না কর্তারা।

আসলে ইউরোপের সঙ্গে মানসিকতারই বিরাট ফারাক এদেশীয় ফুটবল কর্তাদের। ওদেশে জাতীয় দল প্রচুর টুর্ণামেন্ট খেলে, আর তার জন্য ফুটবলারদের মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক দেয়। করা আছে সব রকমের বিমা চুক্তিও। তাই যে সময়টা ওরা দেশের হয়ে খেলে, তখন তাদের চোখ মন সব নিবদ্ধ থাকে দেশের প্রতি। আর দেশের হয়ে খেলার জন্য ১০ থেকে ১৫ দিনের ক্যাম্প করা হয়। কারণ প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠিত ফুটবলার। ক্লাবের হয়ে খেলে খেলে ম্যাচ প্র্যাকটিসের মধ্যেই থাকে। নতুন করে তাদের কিছু শেখানো বা করানোর থাকে না। শুধু সংহতি ও ভাবের আদান-প্রদানের জন্য ক্যাম্প করা হয়। আর এদেশে ক্লাব ম্যাচ খেলা থেকে বিরত করে দীর্ঘ সময়ের জন্য ক্যাম্প করিয়ে তাদের আবেগ, উদ্দীপনাটাই নষ্ট করে দেওয়া হয়। ম্যাচ খেলার থেকে বড় প্রস্তুতি আর কিসে হয়? আর জাতীয় দল বছরে খেলে কটি ম্যাচ? ওই দু-একটা টুর্নামেন্ট আর বছরে একবার পর্তুগাল নিয়ে ক্লাব স্তরের টিমের বিরুদ্ধে ২-৩টি ম্যাচ।

এতসব অব্যবস্থা সত্ত্বেও বলতে হবে বর্তমান প্রজন্মের ফুটবলাররা যথেষ্ট ভদ্র ও দেশের প্রতি দায়বদ্ধ। যখনই তাদের ডাকা হয়েছে ক্লাবের কথা ভুলে গিয়ে শিবিরে গেছেন এবং টুর্ণামেন্টে জান-প্রাণ লড়িয়ে খেলেছেন। কয়েক বছর আগেও ফুটবলাররা শিবিরে যেতে চাইত না। তাই তখন দেশের জাতীয় দল সব টুর্ণামেন্টে মুখ পুড়িয়ে আসত। এখনকার ফুটবলাররা যোগ্যতা-প্রতিভার নিরীখে হয়ত আগের প্রজন্মের ফুটবলারদের তুলনায় পিছিয়ে থাকবেন, কিন্তু সাফল্যের বিচারে তাদের টেক্কা দিয়েছেন। নেহরু কাপ, এ এফ সি কাপে বেশ কয়েকটি ভাল দলের বিরুদ্ধে জয় তুলে এনেছে। সিরিয়া, কাজাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উত্তর কোরিয়া নিঃসন্দেহে সবদিক থেকে ভারতের চেয়ে উন্নততর। বব হাউটনের কোচিংয়ে ফুটবলাররা এটুকু অন্তত বুঝতে পেরেছে যে ক্লাবের হয়ে খেলে বড়লোক হওয়া যায়, কিন্তু দেশের হয়ে ভাল খেললে সমাজে সেলিব্রেটি হয়ে মাথা উঁচু করে ঘোরা যায়।

শব্দরূপ - ৫১০

ইলা বসু

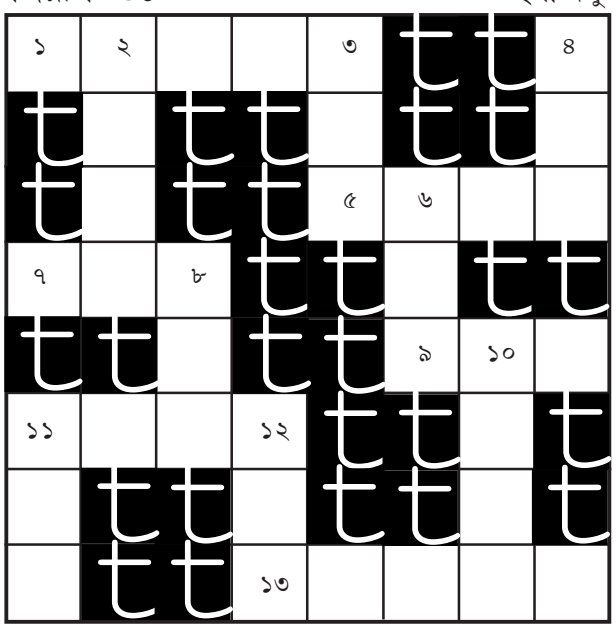

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. স্বনাম প্রসিদ্ধ ঋষিবিশেষ, ৫. মহাভারতের মতে এই স্থান গান্ধারের মধ্যে, এই নগরে এখনও বহু বৌদ্ধ মন্দিরের ভগ্নস্তূপ আছে, ৭. শিবের রুদ্রমূর্তি, শেষদুয়ে আশীর্বাদ, ৯. তৎসম শব্দে ফুলের সাজি, প্রথম দুয়ে হাত, ১১. বিষ্ণু ও শিবের অভেদ মূর্তি, ১৩. শুদ্ধ শব্দে তপস্যা, একে-চারে বিলম্ব, দুয়ে-পাঁচে প্রতিজ্ঞা।

উপর-নীচ ঃ ২. বিষ্ণু, রামকৃষ্ণের ছেলেবেলার নাম, ৩. বিশেষণে ত্রুটিহীন, ৪. ইন্দ্রজিতের পত্নী, ৬. অতি অল্প সময়, ৮. বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার, ১০. রামচন্দ্র, ১১. হোম, আহুতি, ১২. রূপো, বিশেষণে শ্বেতকায়।

সমাধান শব্দরূপ ৫০৮

সঠিক উত্তরদাতা

শান্তনু গুড়িয়া
বাগনান, হাওড়া।
শৌণক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৭

স	হ	স্র	পা	দ	■	■	গ
■	র	■	■	ম	■	■	ঙ্গা
■	ধ	■	■	ন	ট	রা	জ
দ	নু	জ	■	■	গ	■	■
■	■	ং	■	■	র	মে	শ
অ	চ	লি	ত	■	■	ঘ	■
হ	■	■	ড়া	■	■	না	■
ল্যা	■	■	গ	ন্ধ	মা	দ	ন

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ১৫ জুন ২০০৯ সংখ্যায়।

ভারতীয় তীরন্দাজদের সাফল্য অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ইউরোপিয়ান সার্কিটের পর এবার এশিয়ান সার্কিটেও সফল ভারতীয় তীরন্দাজরা। সম্প্রতি তেহেরানে দ্বিতীয় এশিয়ান গ্রাপ্রি মিটে পুরুষ বিভাগে দুই ভারতীয় খেতাব জিতেছেন। এরা হলেন তরুণদীপ রাই, জয়ন্ত তালুকদার। আর মেয়েদের বিভাগে সুইটি কুমারীকেও দেখা গেছে বিজয় মঞ্চে । তরুণদীপ ছেলেদের রিজার্ভ বিভাগে ও জয়ন্ত তালুকদার কমপাউন্ড বিভাগে স্বর্ণপদক জিতে আগামী বছরের শেষার্ধে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমসে পদক প্রাপ্তির সোনালী সম্ভাবনা ফুটিয়ে তুলেছেন। অন্যদিকে দোলা ব্যানার্জির অনুপস্থিতিতেও ভারতীয় মহিলারা আত্মপ্রত্যয় ও মনোবল অটুট রেখে সেরাটুকু মেলে ধরেছেন তেহেরানে।

বেজিং অলিম্পিকের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়েছেন তীরন্দাজরা — একথা মনে করছেন ভারতীয় তীরন্দাজীর সর্বময়কর্তা পরেশ মুখার্জি। বহু বিশ্বস্তরের প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের কোচ বা ম্যানেজার হয়ে গেছেন। তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন লিম্বারাম, শ্যামলাল থেকে লালবেন সাংগা হয়ে আজকের জয়ন্ত, তরুণদীপ, রাহুলদের। পরেশ বাবুর ধারণা প্রতিভার বিচারে লিম্বারাম এদের সবাইকে ছাপিয়ে গেছেন। কিন্তু জয়ন্ত বা তরুণদীপরা অনেক বেশি শৃঙ্খলাবদ্ধ ।

এই বছরই বিশ্ব কাপ তীরন্দাজির প্রথম লেগে জয়ন্ত তালুকদার ও দোলা

ব্যানার্জির ভাই রাহুল ব্যানার্জির পারফরমেন্স তাক লাগিয়ে দিয়েছে তীরন্দাজির ক্ষেত্রে শক্তিধর সব দেশের প্রতিযোগীদের। তীরন্দাজি ও শুটিং হল চূড়ান্ত লক্ষ্যমাত্রিক খেলা। এই খেলায় একই সঙ্গে দরকার নিখুঁত পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, লক্ষ্যে একবগ্গা থাকার কৃত সংকল্প ও সর্বাত্মক মানসিক ও আত্মিক স্থিতধী শক্তি। এই ব্যাপারগুলো গড়ে তুলতে দরকার উন্নত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও শিক্ষিত মনন। লিম্বারাম এই জায়গাতেই মার খেয়ে গেছেন। জয়ন্ত ও রাহুল দু'জনেই এসেছেন মোটামুটি অবস্থাপন্ন পরিবার থেকে ও পরিমার্জিত শিক্ষা সংস্কৃতি নিয়ে। তরুণদীপের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তাই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এদের সাফল্যের মাত্রা ও পরিমাণও বেশি লিম্বারাম ও শ্যামলালের তুলনায়।

তিন পুরুষ তীরন্দাজই এখন জীবনের সেরা ফর্মে রয়েছেন। বিদেশে বহু বড় মাপের টুর্ণামেন্টে নিয়মিত খেলার সুযোগ পেয়ে দক্ষিণ কোরিয়া, ইতালি, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন তীরন্দাজদের সঙ্গে লড়াইয়ের গুণগত ও মৌলিক ক্ষেত্রে নিজেদের কষ্টিপাথরে যাচাই করে অনেক শাণিত করে তুলেছেন। এ ধরনের সুযোগ থেকেও পূর্বসূরীরা বঞ্চি ত ছিলেন। তাই লিম্বারাম অলিম্পিকে পদকপ্রাপ্তির সম্ভাবনা জাগিয়েও টেম্পারমেন্টে মার খেয়ে পদক খুইয়েছেন। বর্তমান প্রজন্মের তীরন্দাজরা টেকনিক ও স্কিলের পাশাপাশি 'কিলার ইনস্টিংকটের' ক্ষেত্রেও বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বীদের সমকক্ষ। এদের কাছ থেকে 'কমনওয়েলথ গেমস্' এবং তারপর ২০১২-র লন্ডন অলিম্পিক থেকে পদক আশা করা যেতেই পারে।

দ্যাখো, দ্যাখো, নাটুকে রাজার কী নিপুণ অভিনয় দ্যাখো

বিশাখা বিশ্বাস

নীতিহীন যত সাঙাৎ হাতে হাতে রেখেছিল হাত, ক্ষোভ আর হুঁস নিয়ে জাগছিল মানুষ, পলপট হোনেকারের দম্ভ আর জিঘাংসা নিয়ে দম্ভী রাজা চলছিলেন, হাতে শিল্পের ফানুস। পঞ্চায়েতের পর লোকসভা নির্বাচনেও তার শিল্পের ফানুস ফেটে গেছে, মানুষ সর্বত্র তাকে ধিক্কার দিয়ে বলেছেঃ তোর মাথায় বুড়ো পুঁজিবাদের বিবর্ণ পালক, হাতে নকল উন্নয়ণের কাঁচা কলা, গায়ে লাল ঝান্ডা, পায়ে কুষ্ঠ, রাজা তুই ফিরে যা .... ফিরে যা ....

রাজাকে ফিরে যেতে হয়েছে। সময় ও জীবনের প্রতি অবিশ্বস্ত, পঞ্চায়েত নির্বাচনে তার বিধবস্ত ভাবমূর্তি, অন্য মতে অসহিষ্ণুতা, শব্দ সঞ্চরনে উদ্ধত এবং বেপরোয়া, হৃতসর্বস্ব অনাস্থার নায়ক, দম্ভী সেই রাজাকে আগ্নেয়গিরির অত্যাসন্ন উদগীরণের মুখেও (বিক্ষুব্ধ মানুষের ঝড়ের মুখেও) তার দল তবু তাকে জনগণের সামনে কেন নিয়ে গেল তা দুর্বোধ্য। কথা ও কাজে সংগতিতে যার কেবলই ব্যর্থতা, উদ্ধত উলঙ্গ ধারহীন ভারহীন যার মুখের ভাষা দলের বিপন্নতাকে বারে বারে ডেকে এনেছে, সেই উৎকেন্দ্রিক পরিমাণবোধহীন চালিয়াত গিমিকে নাটুকে রাজাটিকে কেন শিক্ষিত ও সচেতন এলাকাগুলিতে মানুষের সামনে ভোট সংগ্রহে হাজির করলো তার দল — তাও ব্যাখ্যাবিহীন টাটার প্রতি যে রাজার প্রীতি শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃভক্তির চেয়েও অধিক, সুপ্রতিষ্ঠিত সর্বমান্য শিল্পী-সাহিত্যিকগণের চেয়েও শীল সরকার সর্বাধিকারীর মতো হঠাৎ গজানো কয়েকটি স্তাবকের সাথে যার সম্পর্ক সুভাষ চক্রবর্তী এবং তার টুপীর মতোই অবিচ্ছেদ্য — কেন সেই রাজার নির্বাসন, চাইবে না 'পরিবর্তনকামী' মানুষ, তার দল কী খুঁজবে না তার ব্যাখ্যা, দেবে না তার জবাব?...

যে রাজবংশটাই ভারত ভেঙে ভাগ করেছে, 'আমরা-ওরা'-র তত্ত্বে যে রাজা স্বয়ং রাজ্যের প্রজাকুলকেই ভাগ করে দিয়েছেন — কোন ধৃষ্টতায় সেই রাজার মুখেই উচ্চারিত হয়েছিল 'ওরা বাংলাকে ভাগ করতে চায়' (আলিপুরে ১৯-৪-০৯ তারিখে)? এ কোন ফ্যাসিস্তের ঘোষণা, 'বিজেপি মাথা তুলতে চাইলে মাথা ভেঙে দেবো' (মেটেবুরুজে — ১২-৪-০৯ তারিখে)? সংলাপে শব্দ প্রক্ষেপনে এ কোন নগ্ন মস্তানিঃ সিঙ্গুরে আবার যাবো, কে ঠেকাবে, দেখে নেবো কার কত ক্ষমতা (ঐ)। শিক্ষায়-দীক্ষায় বাকবিন্যাসে তিনি যেমনই হোন তবু তিনি রাজ্যের বিরোধী নেত্রী — ইনি কোন সংস্কৃতিসম্পন্ন রাজা যার মলদ্বারের বর্জ্য পদার্থ মুখ দিয়ে বহির্গত হয়ঃ ওর নাম নিতে ঘৃণা হয়, ওর সাথে কথা বলতেও রুচিতে বাধে? সভ্য সমাজের সংবেদনশীল ইনি কেমন রাজা যার নিয়ন্ত্রণহীন বর্বর সেনানীর কেউ কারো ঠ্যাং ভেঙে দেন, কেউ কাউকে দমদম দাওয়াই দেন, কেউ কাউকে আড়ং ধোলাই করেন, কেউ কাউকে আছড়ে মারেন, কেউ কাউকে পাছা দেখান এমনকী খোদ বিরোধী নেত্রীকেও কেউ বলেন 'বাঁজা' কিম্বা 'পতিতা' অথবা 'রাক্ষসী'? অপভাষা প্রয়োগের একচেটে অধিকার যে কোনও একটি মানুষ বা পক্ষেরই একক নয় পরন্তু সেই ঢিলটিই যে পাটকেল হয়ে ফিরে আসতে পারে আইনজীবী কল্যাণ ব্যানার্জী তা দেখিয়ে দিয়েও লক্ষাধিক ভোটে জিতে 'বুদ্ধের পাদুকা' 'জুতো' তারই কতিপয় পোষা বুদ্ধিজীবীর দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন — হু 'হ্যাজ বীন পেড ব্যাক ইন হিজ ওন কয়েন'?....

'দুঃসময়'-এ পদত্যাগ করার নাটুকে ভাণ ও ভণিতা পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরই পুরনো ইতিহাস হয়ে গেছে, যেমন পুরোনো হাসির খোরাক হয়ে আছে চোরেদের সেই ক্যাবিনেট ছাড়ার ইতিকথা। পালানো না পালানো তাঁর নিজস্ব ব্যাপার কিন্তু রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে রাখা তার মলমূত্র আবর্জনা অপসারণের দায়িত্ব নেবেন কে? যে খড়্গাপুরে বিরোধীরা কোনওদিন 'না' বলেনি সেখান থেকে টাকার কারখানা কোথায় গেল — তার জবাব দেবেন কে? যে শালবনীতে বিরোধীরা 'না' বলেনি সেখানে ইস্পাত উৎপাদন হবে না বলে কেন জিন্দেলরা জানিয়ে দিল — তার জবাব দেবেন কে? বোলপুরে শিবতলায় বিরোধীরা 'না' বলেনি তবু কেন কেড়ে নেওয়া শত শত একর জমি সাত বছর ধরে পড়ে রয়েছে — তার জবাব দেবেন কে? পৌণঃপুনিক মিথ্যাচারের বোঝা মাথায় বয়ে দায়হীন দায়িত্বহীন যে অপদার্থ রাজা বুকনিবাজির ক্লান্তিহীন অনর্গলতায় বিরোধী পক্ষকে কেবল 'দায়িত্বহীন' বলে চীৎকার করে গেলেন — সত্যের ছাঁকনিতে তার সব বাগাড়ম্বরকে ছেঁকে নিয়ে মানুষ দেখেছে ছাঁকনির ওপরে কেবলই মিথ্যার ছাই, তলায় পাত্রে জমা দুধের বদলে শুধুই জল।...

জার্মানীর পতনের জন্যে দরকার ছিল একজন গোয়েবেলের। রাশিয়ার পতনের জন্য দরকার ছিল একজন ব্রেজনেভের। ইন্দিরা জমানার পতনের জন্যে দরকার ছিল একজন সিদ্ধার্থ রায়ের। বামফ্রন্টের পতনের জন্যেও দরকার ছিল একজন বুদ্ধের — লজ্জা কী রাজা, পশ্চাৎদেশে পদাঘাত না করলে কোনও লাল শাসক অথবা কোনও 'রেড-লেডী' স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন বলে তো কোনওদিন শোনা যায়নি!....

এগিয়ে চলো কমরেড। হের হিটলার পিয়ানো বাজাতে বাজাতেই তার বৈদ্যুতিক কাঁটাতারের ওপর মানুষকে ঠেলে দিতেন। দোষ কী, যদি কোনও কমরেড মায়াকোভস্কি পড়তে পড়তেই বেয়নেটে হাত রেখে শিল্পের ফুল তোলেন? পদত্যাগ? ছিঃ, জীবন পলায়নের জন্যে নয় কমরেড!....

> **“বামফ্রন্টের পতনের জন্যেও দরকার ছিল একজন বুদ্ধের — লজ্জা কী রাজা, পশ্চাৎদেশে পদাঘাত না করলে কোনও লাল শাসক অথবা কোনও 'রেড-লেডী' স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন বলে তো কোনওদিন শোনা যায়নি!....”**

মাননীয় রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী অধ্যাপক রায়কে পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্মান জানাচ্ছেন।

'আকাদেমি সম্মান'-এ ভূষিত হলেন অধ্যাপক প্রণব রায়

সংবাদদাতা ।। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাপূর্ণ 'আকাদেমি সম্মান' পেলেন 'স্থাপত্যকলা'য় (মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যকলা) বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক ডঃ প্রণব রায়। গত ৮ মে শুক্রবার কলকাতার জোড়াসাঁকো রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ৩৪তম সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী অধ্যাপক রায়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৮-০৯ সালের ''আকাদেমি সম্মান'' প্রদান করেন। 'আকাদেমি সম্মানে' পুরস্কারের মধ্যে একটি শংসাপত্র, সুন্দর কারুকার্যকরা বৃহৎ ধাতব পাত্রে উৎকৃষ্টমানের পাঁচ প্রকার ফল ও মিষ্টান্ন, কুড়ি হাজার টাকার চেক প্রভৃতি দেওয়া হয়। ডঃ রায়ের ইংরাজিতে লিখিত ছবিসহ সংক্ষিপ্ত জীবনী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্মারক পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। পুরস্কার প্রদানের সময় আচার্য এবং উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ করুণাসিন্ধু দাস অধ্যাপক রায়ের সারা জীবনের গবেষণা বিশেষ করে, মন্দির-স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও অন্যান্য দৃশ্যকলার ওপর তাঁর গবেষণার উচ্চ প্রশংসা করেন। উপাচার্য তাঁর দীর্ঘ প্রতিবেদনে পুরস্কার প্রাপকগণের গুণাবলীর বিশেষ উল্লেখ করেন। সমাবর্তনের প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক এইচ এ রঙ্গনাথ। আচার্য শ্রীগান্ধী বাংলায় ভাষণ দেন, যা খুবই প্রশংসিত হয়। কয়েক হাজার দর্শক, ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকা সুসজ্জিত মণ্ডপে উপস্থিত ছিলেন। সুমধুর বেদগান ও রবীন্দ্রসঙ্গীতে বিশাল সমাবর্তন মণ্ডপে এক স্বর্গীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

সমাবেশ সমাচার

মুর্শিদাবাদে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির শিবির

সংবাদদাতা ।। গত ২৮ এপ্রিল বিকেল থেকে ১ মে সকাল পর্যন্ত রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির উদ্যোগে মুর্শিদাবাদ জেলার চাণক-এ প্রণবানন্দ আদিবাসী আবাসিক বিদ্যালয়ে তিন দিনের শিবির হয়ে গেল। সমিতির অধিকারী, শিক্ষিকা, প্রবন্ধিকা ও শিক্ষার্থীসহ মোট ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। শিবির অধিকারী ছিলেন রীতি সরকার। কার্যবাহিকা অর্পণা দাস। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ শিবির উদ্বোধন করেন। পূজ্য হিরন্ময়ানন্দজী শিবিরে উপস্থিত হয়ে সকলকে আশীর্বাদ জানান। সমিতির কার্যবাহিকা মহুয়া ধর, মুক্তিপ্রদা সরকার, মিনতি সেন, রত্না দাশগুপ্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, আগামী ৩০ মে থেকে ৭ জুন পর্যন্ত উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট সরস্বতী শিশু মন্দিরে সমিতির দক্ষিণবঙ্গ শাখার শিবির অনুষ্ঠিত হবে।

বামরাজত্বে চরম বঞ্চনার শিকার খড়্গাপুর বাসস্ট্যাণ্ড

সংবাদদাতা ।। সেই '৭৭ সাল থেকেই মেদিনীপুর জেলাতে সি পি এম-এর রমরমা। পরে জেলা ভাগ হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গাপুরের এর নাম বিশ্বের রেল মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে দীর্ঘতম রেল প্লাটফর্মের জন্য। প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী যাতায়াত করলেও বাস স্ট্যাণ্ডের উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন হয়নি।

গত ৩২ বছরেও যাত্রীদের দাঁড়ানোর জন্য মাথার উপরে ছাদের ব্যবস্থা করতে পারেনি সরকার বা পুরসভা। সুভাষবাবুর পরিবহন দপ্তরের কোনও হেল-দোল নেই। এ বছরের মারাত্মক রোদ্দুরে বাসযাত্রীদের ভরসা ছাতাই। তবে একটু ভালো — আগে বাসস্ট্যাণ্ডে ধানচাষের অবস্থা হোত সামান্য বৃষ্টিতেই। এখন তা একটু উঁচু করা হয়েছে মাত্র। পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। প্রস্রাবাগার বা পায়খানাও অপ্রতুল। প্রস্রাবের জন্যও পয়সা লাগে। অথচ বাম-সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাসভাড়া প্রায় বারোগুণ বেড়েছে। আগে খড়্গাপুর থেকে মেদিনীপুর বাসভাড়া ছিল মাত্র ৪৫ পয়সা। এখন তা বেড়ে ৬ টাকার বেশি।

মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রে সদ্য পরাজিত তৃণমূল নেতা দীপক ঘোষ যখন মেদিনীপুরের জেলা শাসক ছিলেন তখন তাঁর উদ্যোগে মেদিনীপুর বাসস্ট্যাণ্ড নির্মাণ করিয়েছিলেন।

সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ-র বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ৩ মে' হাওড়ার কেশব স্মৃতিতে সংস্কার ভারতী-পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল। বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। উপস্থিত ছিলেন কেশব দীক্ষিত, শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ, রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, আমীর চাঁদ প্রমুখ বিশিষ্ট কার্যকর্তারা।

সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদিকা মনোনীত হন যথাক্রমে ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায়।

বর্ষবরণ উৎসব

১৩ এপ্রিল পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের 'পূর্বশ্রী' প্রেক্ষাগৃহে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের বর্ষবরণ ১৪১৬ উদ্‌যাপিত হল। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা তথা সংস্কার ভারতীর সভাপতি ভিক্টর ব্যানার্জী। সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জীর লোকার্পণ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী জিতাত্মানন্দ। শেষে বিভিন্ন শাখার উদ্যোগে সঙ্গীত, নৃত্য পরিবেশিত হয়।

মঙ্গলনিধি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমার সিতাই খন্ড কার্যবাহ রামকৃষ্ণ বর্মণ তাঁর বিবাহ উপলক্ষে ৭ মে সমাজের সেবায় ৫০১ টাকা মঙ্গলনিধি প্রদান করেন। রামকৃষ্ণ বর্মণের মাতৃদেবী জেলা কার্যবাহ চন্দন কুন্ডুর হাতে ওই টাকা তুলে দেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রচারক অঙ্কুর সাহা, মহকুমা ব্যবস্থা প্রমুখ ভূপেন দত্তসহ অন্যান্য কার্যকর্তাবৃন্দ।

গত ১৬ মে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বেহালা শাখার স্বয়ংসেবক তপন গাঙ্গুলী তার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে সমাজের সেবা কাজের জন্য মঙ্গলনিধি হিসাবে বাস্তুহারা সহায়তা সমিতিকে ৫০০১ টাকা প্রদান করেন। সমিতির পক্ষে সম্পাদক জীবনময় বসু এই মঙ্গলনিধি গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের পশ্চিম কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা নগরের স্বয়ংসেবক মানব ঘোষের (ভেল্টু) বিবাহ উপলক্ষে গত ১২ মে প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বরিষ্ঠ প্রচারক শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে সমাজের সেবা কাজের জন্য কিছু অর্থ মঙ্গল নিধি হিসাবে প্রদান করা হয়।

সতীশ চন্দ্র বর্মণ, জেলা কার্যবাহ চন্দন কুণ্ডু, জেলা কার্যবাহ প্রবীর রায়, জেলা প্রচারক অঙ্কুর সাহা প্রমুখ কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

Swastika
1 June - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

প্রভাকরণের যুগ শেষ

তামিলদের সমস্যার সমাধান কোন পথে?

মাহিন্দা রাজাপক্ষে

অর্ণব নাগ ।। আর পাঁচটা উদ্বাস্তু শিবিরের তুলনায় ছবিটা একেবারেই আলাদা নয়। না আছে ত্রাণের কোনও ব্যবস্থা, না আছে চিকিৎসার কোনও বন্দোবস্ত, আছে শুধু মৃত্যু ভয়ে পালানো; সব মিলিয়ে অসহায় এক মর্মস্পর্শী ছবি। বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেলে উঠে আসা শ্রীলঙ্কা দ্বীপের ছবিটা ঠিক এরকমই। শ্রীলঙ্কার সর্বাধিনায়ক মাহিন্দা রাজাপক্ষে পূর্বেই ঘোষণা করেছিলেন, তাঁদের লড়াই বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে। সেই লড়াই জঙ্গি সংগঠন এল টি টি-ই এবং তাদের সুপ্রিমো প্রভাকরণের বিরুদ্ধেও বটে। অবশেষে বোধ হয় বিগত তিন দশকের মিথ প্রভাকরণ যুগের অবসান হতে চলেছে। বোধ হয় বললাম এই কারণেই, যে এর আগেও অন্তত একডজনবার তিনি মরেও বেঁচে উঠেছেন। আর এবারেও তাঁর মৃত্যুর স্বপক্ষে যে প্রমাণগুলি দিচ্ছে শ্রীলঙ্কা সরকার ও সেনাবাহিনী তাতেও বেশ কয়েকটি বড় ধরনের ফাঁক রয়েছে। কিন্তু যেটা মানা যাচ্ছে না, কিছুতেই মানা যাচ্ছে না, তা হল শ্রীলঙ্কা সেনাবাহিনীর নাস্থিকাডাল হ্রদের ধারে 'নো ফায়ার

নিরাপদ আস্তানার খোঁজে ভীত তামিলরা।

জোন'-এ গুলিবর্ষণের ঘটনা এবং তাতে অসংখ্য অসামরিক ব্যক্তির মৃত্যু। সরকারের পক্ষ থেকে যদিও এ ব্যাপারে দাবি করা হয়েছে শুধুমাত্র প্রভাকরণকে নিশ্চিহ্ন করতেই এ ধরনের গুলি চালানো। কিন্তু যুক্তিটা বড্ডই ছেঁদো ঠেকছে। ঘটনা হল সেনা সূত্রে একসময় দাবি করা হয়, মুল্লাইথিভু অঞ্চলের মাত্র ৩০০ বর্গমিটার এলাকার মধ্যে ঘিরে ফেলা হয়েছে তাঁকে। অথচ গত ১৯ মে তাঁর গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার হল সেই 'নো ফায়ার জোন' থেকেই! এই অপকর্ম ঢাকার জন্য এক অস্বাভাবিক প্রয়াস চালাচ্ছে রাজাপক্ষে সরকার। লঙ্কার শরণার্থী শিবিরে খেতে-পড়তে না পাওয়া, বিনা চিকিৎসায় থাকা হাড্ডিসার তামিল নাগরিকদের কাছে রেড ক্রস, রাষ্ট্রপুঞ্জ বা আন্তর্জাতিক ত্রাণসংস্থার ত্রাণ পৌঁছে দিতে বড়ই বাধা দিচ্ছেন রাজাপক্ষে। ভারতের পাঠানো ত্রাণেরও ঠিকঠাক সদ্‌গতি করেছেন কিনা তারও কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ রেডক্রস এবং হু-কে এখনও অবধি শরণার্থী শিবিরে প্রবেশের কোনও অনুমতিই দেননি রাজাপক্ষে!

তবে আন্তর্জাতিক মিডিয়া এক প্রকার ধরেই নিয়েছে লিবারেশন টাইগার অব তামিল ইলম প্রধান ভেলুপিল্লাই প্রভাকরণ শেষ অবধি মারাই গেছেন। কিন্তু এ নিয়ে একেকবার শ্রীলঙ্কা সরকারের একেকরকম বক্তব্য, সেই সাথে ঢাক ঢাক গুড় গুড় ব্যাপার প্রভাকরণের মৃত্যু ঘিরে বিতর্ক দানা বাঁধছে। ডি এন এ পরীক্ষাতেই বা এত অনীহা কেন রাজাপক্ষে সরকারের? গুরুতর প্রশ্ন উঠছে এ নিয়ে। বিশেষ করে প্রভাকরণের পুত্র চালর্স অ্যান্টনিরও যখন একই সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে। বেসরকারি সূত্র উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, প্রভাকরণের ডি এন এ পরীক্ষা হয়েছে এবং এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত সেই পরীক্ষার ফলাফল হাতে আসেনি। তবে যাবতীয় সংশয় কাটিয়ে তামাম বিশ্ব এখন মনে করছে প্রভাকরণ যুগের অবসান হয়েছে।

যুগ যুগান্তের সঞ্চিত ব্যথা কীভাবে এই প্রভাকরণ অভিযানের ঘোষণা করেছিল সে দিকে ফিরে তাকানোর প্রয়োজন আজ অনুভব করছেন রাষ্ট্রবিদরা। একটি বিষয়ে তাঁরা একমত, শ্রীলঙ্কার তামিলদের ওপর দীর্ঘদিনের অবহেলা, আর সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলী কর্তৃক তামিলদের ওপর অবিচারের ক্ষোভই এক ধরনের তামিল সেন্টিমেন্টের জন্ম দিয়েছে, যার হাত ধরেই উত্থান ঘটেছে প্রভাকরণের মতো জঙ্গির। তাঁকে কেন জঙ্গি বলালম এ বিষয়ে পরে আসছি। তার পূর্বে দেখে নেওয়া যাক, এই তামিল আন্দোলনের শেকড় কত গভীরে লুকিয়ে রয়েছে।

১৯৪৮ সালে বৃটিশ শাসনের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে নতুন করে পথচলা শুরু করে শ্রীলঙ্কা। স্বাধীনতার সেই মহেন্দ্রক্ষণেই সিলোন সিটিজেন্স অ্যাক্টের ১৮ অনুচ্ছেদ বলে কেড়ে নেওয়া হয় তামিলদের নাগরিকত্বের অধিকার। শুরু হয় তামিলদের প্রতি দীর্ঘ বঞ্চনার ইতিহাস। এমনকী কেড়ে নেওয়া হয় তাদের ভোট দেবার অধিকারও। ১৯৫৬ সালে পাশ হয় সরকারি ভাষা বিধি (The Official Language Act, No-33)। যার মধ্যেই কিন্তু লুকিয়ে ছিল দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে চলে আসা এই সংঘর্ষের বীজ। সেই আইন অনুযায়ী সিংহলীকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়, বাতিল করা হয় তামিল ভাষার স্বীকৃতি। এছাড়া আরও একটা দিক রয়েছে — শ্রীলঙ্কার তামিলদের প্রায় সবাই শৈব হিন্দু। কিন্তু তাদের ওপর একমাত্র ধর্ম হিসেবে ১৯৫৮ সালে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় বৌদ্ধ ধর্মকে। স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের দাবিকে কেন্দ্র করে এরপর দু'দশক (১৯৫৬-১৯৭৬) ধরে চলে তা আদায়ের সংগ্রাম। অতঃপর যাবতীয় তামিল পার্টিগুলিকে এক ছাদের তলায় এনে ১৯৭৬ সালে গঠিত হয় তামিল ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট (TULF)। ওই বছরের ১৪ মে ভাদুকোদাই-এ যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তার সার বক্তব্য ছিল — তামিল সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রীলঙ্কার উত্তরাংশ ও পূর্বাংশ নিয়ে গঠিত হোক তামিল ইলম (স্বতন্ত্র রাষ্ট্র) এবং ঐতিহাসিকভাবে চিলো-এর ওয়ালয়া নদীর পাড়ে শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে গড়ে ওঠা সিংহলী সভ্যতার মাঝে বসবাস

মৃত প্রভাকরণ

করুক সিংহলীরা। এর মধ্যে সবচেয়ে যেটা উল্লেখযোগ্য তা হল, সিলোন এবং পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে বসবাসকারী তামিল ভাষাভাষী মানুষরা এই ইলমের নাগরিকত্ব পাবেন। মূলত, এই দাবির ওপর ভিত্তি করেই ১৯৭৭ সালে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছিল TULF। কিন্তু তাদের যাবতীয় উদ্যোগে জল ঢেলে দিয়েছিল ওই বছরেই তামিল বিরোধী দাঙ্গা। ইতিপূর্বে শ্রীলঙ্কায় '৫৮-তেও একইভাবে বড় ধরনের জাতিদাঙ্গা সংগঠিত হয়।

আশির দশকের শুরুতে শ্রীলঙ্কা-তামিল বিবদমান দু'পক্ষের জন্য বহু ট্রেনিং ক্যাম্প চালু করে ভারত পরোক্ষভাবে মধ্যস্থতা করতে শুরু করে। কিন্তু ১৯৮৩ সালে শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোয় এক সংগঠিত হত্যাকান্ডে প্রায় দু'হাজার তামিল প্রাণ দেন। যে ঘটনা শ্রীলঙ্কার তামিলদের মনে শুধু গভীর ক্ষতেরই সৃষ্টি করেনি, একই সঙ্গে আঘাত করেছিল তামিল আন্দোলনের উত্তাল আবেগের তরঙ্গকে। যার দরুণ শ্রীলঙ্কার মধ্যেই তামিলরা আলাদা নিজস্ব একটা দেশ তৈরি করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৮৫ সালের ১৩ জুলাই সমস্ত রাজনৈতিক ও যুদ্ধরত গোষ্ঠীগুলিকে এক করে তামিল লিবারেশন অর্গানাইজেশন শ্রীলঙ্কায় যোজন দূরে সরিয়ে দেয়।

এবার আসি প্রভাকরণের কথায়। তিনি রবীন হুডের মর্যাদা পাওয়া তো দূরের কথা, চিরকাল নিছক একজন মাফিয়া হিসেবেই পরিচিত হয়ে থাকবেন। কারণ যে তামিল স্বার্থকে কেন্দ্র করে তিনি উঠে এসেছেন, তাঁদের স্বার্থ রক্ষার তাগিদ হয়ত তাঁর ছিল। সেই সঙ্গে ছিল তামিলদের একমাত্র ঈশ্বর রূপে নিজেকে প্রতিভাত করবার এক দুরূহ আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়েই তিনি হত্যা করেছিলেন তাঁর সমমনোভাবাপন্ন সহযোগী দুই সংগঠন — টেলোর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসবারত্নম ও TULF-এর তামিলদের স্বায়ত্তশাসন ও নাগরিকত্বের অধিকার সম্বলিত চার দফা মৌলিক দাবি সনদ পেশ করে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। পরবর্তী দু'বছর অত্যাচার অব্যাহতই থাকে তামিলদের ওপর। অবশেষে ১৯৮৭ সালের ২৯ জুলাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি জে আর জয়বর্ধনের ঐতিহাসিক ভারত-শ্রীলঙ্কা সমন্বয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সে দেশে শান্তি রক্ষার্থে ৯০ সালে রাজীব ভারতীয় শান্তি রক্ষা বাহিনীকে শ্রীলঙ্কায় পাঠান। কিন্তু শ্রীপেরুম্বুদুরে '৯১-এ রাজীব গান্ধীর ওপর এল টি টি-ইর আত্মঘাতী হামলা এই সমস্যাকে সমাধানের পথ থেকে বহু

তামিলদের বিক্ষোভ

নেতা অমৃতলিঙ্গমকে। ১৯৯০ সালে শ্রীলঙ্কার আরেক তামিল দল ইউ পি আর এল এফ নেতা পদ্মনাভ ও তার সহযোগী ১৩ জনকে নৃশংসভাবের খুন করান প্রভাকরণ। সাম্প্রতিক যুদ্ধেও নিরীহ তামিলদের ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করানোর ঘটনা তাঁকে অসামরিক তামিলদের কাছে আরও ভীতিপ্রদ করে তুলেছিল।

প্রভাকরণ তো শেষ। তবে সমাধান কোন পথে? প্রভাকরণ যাঁকে হত্যা করেছিলেন সেই শ্রীলঙ্কার শান্তি সম্পাদকমন্ডলীর মহাসচিব কেথসত্তারান লাগানাথন এবিষয়ে একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র দিয়েছিলেন তাঁর বিখ্যাত বই 'Sri Lanka : Lost opportunities'-এ। তাতে তিনি '50-50 formula' এর ওপর ভিত্তি করেই 'balanced representation'-র কথা বলেছেন। অর্থাৎ তাঁর কথামতো শ্রীলঙ্কার ক্যাবিনেটের পঞ্চাশ শতাংশ বরাদ্দ থাকবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলীদের জন্য এবং বাকি অর্ধেক অংশ বরাদ্দ হবে সংখ্যালঘু অধিবাসীদের জন্য। সেই সাথে সংখ্যালঘুদের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দের (mandatory representation) কথাও তিনি তাঁর পুস্তকে উল্লেখ করেছেন।

স্বাধীনতা পূর্ব যুগে বৃটিশ কর্তৃক নিয়োজিত সোলাবরি কমিশনও এই ৫০-৫০ ফরমুলাকে কোনও স্বয়ংসম্পূর্ণ সরকারের কাছে অবধারিত হিসেবে গণ্য হবে বলে মনে করেছিল। শ্রীলঙ্কার তামিলদের দুর্ভাগ্য স্বাধীনোত্তর যুগে দীর্ঘ দু'দশক ধরে তারা এখনও পর্যন্ত কোনও স্বয়ংসম্পূর্ণ সরকার পেল না। সে রকম কোনও সরকার যে আগামী দিনে আসবে তার দূরতম কোনও ইঙ্গিতও মিলছে না। তাই এক প্রভাকরণ গিয়েছেন, অন্য কোনও এক প্রভাকরণের প্রতীক্ষায় থাকবে হয়তো তামিলরা।

যুদ্ধের বলি নিরীহ তামিলরা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com